BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

হুমায়ূন আহমেদ

অদ্ভুত সব গল্প

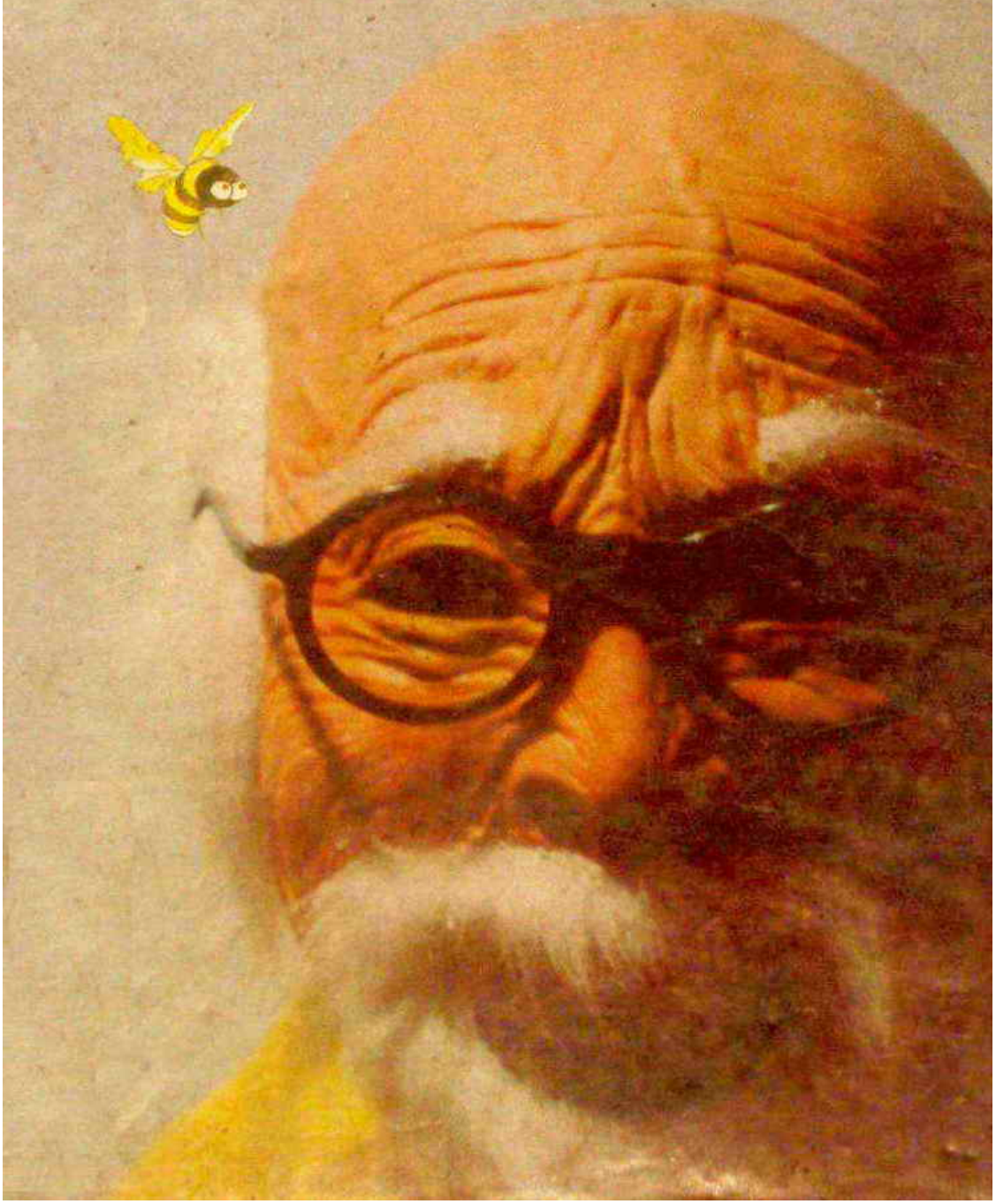

প্রকাশকের কথা

জীবনের সৌন্দর্য আর মহত্ত্বের সন্ধানে ব্রতী কথাশিল্পী বিচিত্র পরিবেশে তার উদ্দিষ্ট খুঁজে বেড়াবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর এ ক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদের ঐকান্তিকতা সুপরিজ্ঞাত। বৈচিত্র্যের এ সন্ধানই তাঁকে নিয়ে যায় ভূত আর অদ্ভুত রসের এক অদ্ভুতুড়ে অঙ্গনে। এই পরিক্রমণের ফসল এ বই-এ সংকলিত সদ্যরচিত গল্প-পঞ্চক। গল্পগুলো কেমন হয়েছে সে রায় দেবেন পাঠকেরা। আমাদের জানিয়ে দেয়ার কথা একটাই — ভূত আর অদ্ভুত রসে শিশু-পাঠকের অগ্রাধিকার সত্ত্বেও এ গল্পগুলো রচিত হয়েছে শৈশব-পেরুনো সব বয়েসের পাঠককে সামনে রেখে।

আনন্দের এ আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর সঙ্গে জানিয়ে রাখছি, বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমাদের আনন্দ পূর্ণতা পেয়েছে।

আলতাফ হোসেন

গুণীন

[illegible] চান্দ শাহ ফকির।

[illegible] না — নকল নাম। আসল নাম সেকান্দর আলি। যারা মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে কাজ করে তাদের অনেক রকম ভেক ধরতে হয়। নামও বদলাতে হয়। [illegible] সাধারণ সম্পর্ক মানুষের মত হলে চলে না। সাধারণ মানুষের ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা অর্জনের জন্যে তাদের সবক্ষণই নানান চেষ্টা চালাতে হয়।

চান্দ শাহ ফকিরকে দেখে সাধারণ মানুষের ভয় ভক্তি-শ্রদ্ধা কোনটাই হয় না। [illegible] একজন মানুষ। বেঁটেখাটো সুঠাম চেহারা, চান্দ শাহ খানিকটা [illegible] খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কারণ বাঁ পা একটু গেলে হয়েছে। বাঁ পা টেনে টেনে [illegible] হয়। অন্যান্য গুণীনদের মত মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল আছে। তাদের সবক্ষণই [illegible] থাকে। গলায় তিন রকমের হাড়, কাঠ এবং অষ্টধাতুর মালা আছে, তারপরেও [illegible] সবাই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তাকে চান্দ শাহ ফকির ডাকে না -- ডাকে [illegible]। চান্দ শাহ তার স্ত্রীর কাছে এই নিয়ে খুব দুঃখ করে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপতে [illegible] বলে — দেখ কষ্ট মানুষের বিচার। আমি এতবড় একটা গুণীন। পশু-পাখি [illegible] আমাকে সমীহ করে। যে গাছের নিচে বসি সেই গাছে পাখ-পাখালি থাকে না। [illegible] চলে যায়। অথচ নিজ গ্রামের মানুষ আমারে তুচ্ছ করে। সামনে দিয়া যায়, সালাম দেয় না। আমার যে নাম চান্দ শাহ ফকির, এই নামে ডাকে না, ডাকে চান্দু। [illegible] ইচ্ছা করে মারী-মন্ত্র দিয়া এদেরে একটা শিক্ষা দেই। জন্মের শিক্ষা।

চান্দ শাহের স্ত্রীর নাম ফুলবানু। সে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে এখন বিছানায় [illegible]। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই তবে জিভ্বা অত্যন্ত সচল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে

— কি মন্ত্রের কথা কইলেন?

'মারী-মন্ত্র। মন্ত্র ঝাড়া মাত্র গ্রামের ঈশাণ কোন থাইকা শুরু হবে রোগব্যাধি — আস্তে আস্তে পুরা গ্রাম। বড় কঠিন মন্ত্র। একবার ঝাড়লে মন্ত্র কাটান দেওয়া মুশকিল। তুমি যদি বল একবার মন্ত্র ঝাড়ি। উচিত শিক্ষা হউক। গ্রামের সব মুরুব্বী যখন পায়ের উপরে উপুড় হয়ে পরব তখন একটা বিবেচনা হবে।'

ফুলবানু বলল, এই জাতের কথা বলতে আফনের শরম লাগে না? মন্ত্রের আফনে কি জানেন? কাঁচকলাটা জানেন।

'বউ, কি বললা?'

'বললাম মন্ত্রের আফনে কাঁচকলাটা জানেন। আফনে হইলেন ঠগ। বিরাট ঠগ।'

'ঠগ বললা?'

'হ্যাঁ বললাম। অহন কি করবেন? বান মারবেন?'

'বান তো মারতেই পারি। বান মারা কোন বিষয় না। হাতের ময়লা।'

'মারেন দেখি একটা বান।'

চান্দ শাহ হুঁকায় তামাক ভরতে ভরতে বলল, তুমি রোগী মানুষ বইল্যা ছাইড়া দিলাম। না হইলে সরিষা মন্ত্র দিয়া দিতাম। দেখতা, বিষয় কি! হাতের তালুর মধ্যে পাঁচটা কাঁচা সরিষা নিয়া মন্ত্র পড়তে হয়, তারপরে সেই সরিষা ছুইড়া দিতে হয় শইল্যে। সরিষা তো না, সাক্ষাত হাবিয়া দোজখের আগুন। শইলের যে জাগাতে লাগবে সেই জাগাত সাথে সাথে গোল আলুর মত ফোসকা। সারা শইল্যেও মনে হইব আগুন জ্বলতাছে। ইচ্ছা হবে শীতল পানিতে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। ঝাঁপ দিয়া পড়লে আরো বিপদ। পানি তখন আগুনের মত। শইল্যে পানি লাগল কি গেল।

'দেন না এট্টু সরিষা পড়া। আফনের ক্ষমতাটা দেখি। দেখি আফনে কত বড় গুণীন। বিয়ার পর থাইক্যা আমি শুনতাছি — আমার এই ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা, মারী-মন্ত্র, সরিষা মন্ত্র। ভর ভর কইরা বলেন, বলতে শরমও লাগে না। ছিঃ ছিঃ!'

'রাগ উঠাইও না বউ। রাগ উঠাইলে নিজের ক্ষতি হবে।'

'আহারে — রাগ উঠাইলে নিজের ক্ষতি হবে! কি আমার উস্তাদ। দুনিয়ার বেবাক মন্ত্র জানে। তার হুকুমে চলে জ্বীন পরী। হেই লোক দুই বেলা ভাত পায় না। আফনের পুষা জ্বিন যেন কয়টা আছে?'

তামাক টানতে টানতে চান্দ শাহ উদাস গলায় বলে — আমার পোষা না। আমার বাপজান পুষেছিলেন — এখন আমার দখলে আছে। তিনটার ভেতর একটার মৃত্যু হয়েছে। এখন আছে দুইটা। একজনের নাম দাস্তিন, আরেকজনের নাম নাস্তিন। এরা দুই সহোদর ভাই।

'দুই জ্বীন আফনের হুকুমের চাকর। হেই দুই জ্বীনরে দিয়া এক কলসি সোনার মোহর আনাইয়া দেন। যে কয়টা দিন বাঁচি আরাম কইরা বাঁচি। ভালমন্দ কিছু খানা খাই। দুই হাতে ছয় গাছি, ছয় গাছি সোনার চুড়ির আমার বড় শখ।'

চান্দ শাহ্ গম্ভীর মুখে বলে, সোনার মোহরের কলসি কোন ব্যাপারই না বউ। জ্বীনেরে আইজ বললে আইজ আইন্যা দিবে। কিন্তু নিষেধ আছে। নিজের লাভের জন্যে কিচ্ছু করার উপায় নাই। আমার হাত-পা বান্ধা বউ। তাহলে শোন তোমারে একটা গল্প বলি — আমার পিতার আমলের কথা। উনার যেমন জ্বীনসাধনা ছিল, তেমনি ছিল পরীসাধনা। একটা পরী ছিল ওনার খুব পেয়ারের। তার নাম একরার বেগম। বড় সৌন্দর্য ছিল সে। চান্দের আলোর মত গায়ের রঙ। আহা রে, কি বিউটি!

'কানের কাছে ভ্যান ভ্যান কইরেন না। জ্বীনসাধনা পরীসাধনা, ওরে আমার সাধক রে! দূর হন দেখি, দূর হন।'

স্ত্রীর কটু কথায় চান্দশাহর মত বড় সাধককে খুব বিচলিত হতে দেখা যায় না। সে হুঁক্কা হাতে বাড়ির সামনের উঠানে ছাতিম গাছের নিচে এসে বসে। দিনের বেশিরভাগ সময় এই গাছের নিচেই সে বসে। কিছুদিন আগেও ছাতিম গাছে একটা সাইনবোর্ড ঝুলতো।

চান্দশাহ ফকির
জ্বীনসাধনা, পরীসাধনা,
তাবিজ, যাদু-টোনা, বশীকরণ,
মারণ, উচাটন, কড়ি চালনা,
বাটি চালনা, তেলপড়া, চুনপড়া
(বিফলে মূল্য ফেরত)

রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে, তুফানে সাইনবোর্ড পচে গলে গিয়েছে। নতুন সাইনবোর্ড কিনতে একশ' কুড়ি টাকা লাগে। এত টাকা চান্দ শাহ্র নেই। সে হত-দরিদ্র। কাজেই তাকে এখন মূর্তিমান সাইনবোর্ড হিসেবে বসে থাকতে হয়। বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ গেলে গভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে — কে যায়? আজিজ মিয়া না? খবর কি? — বস, দুই একটা গফসফ করি। শরীর ভাল? মুখটা মলিন দেখতেছি কেন?

আজিজ মিয়ার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। ভিন গ্রামের কেউ গুণীনের খোঁজে এলে চান্দশাহ ফকিরের ভাবভঙ্গি বদলে যায়। সে ভারি গলায় বাড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় — মোবারক, তামুকে আগুন দেও দেখি। মোবারককে এম্নিতে তুই তুই করে বলা হলেও এই সময় তার সম্বোধন হয়ে যায় তুমি।

মোবারক চান্দ শাহ ফকিরের সঙ্গে থাকে। ফকিরকে সে মামা ডাকে। তার বয়স এগারো। অকাট গাধা। গাধারা যেমন কাজকর্মে ভাল হয় মোবারকও কাজকর্মে ভাল। রান্নাবান্না, কলসি করে টিউবওয়েলের পানি আনা, হাট-বাজার করা, কাপড় ধোয়া, রোগীর যত্ন — সব সে একাই করে। হাসিমুখে করে। চান্দশাহ ফকির মোবারককে বেতন দেয় না, সেই সামর্থ তার নেই — দু'বেলা খাওয়া দিতে পারে

না, বেতন তো অনেক পরের ব্যাপার। মোবারকের তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। সে আনন্দেই আছে, কারণ চান্দশাহ ফকিরের আশেপাশে থাকাকেও সে ভাগ্য বলে মনে। চান্দ শাহ ফকির তাকে পছন্দও করে। মন টন খুব উদাস হলে মোবারককে ডেকে বলে —

'ও মোবারক! তোর কোন চিন্তা নাই — মন দিয়া কাজকর্ম কর। আমার মৃত্যুর আগে তোরে একটা ফকিরি বিদ্যা দিয়া যাব। সব দিতে পারব না। বড় কঠিন বিদ্যা। তবে একটা পাবি। একটা বিদ্যাই যথেষ্ট। সারা জীবন এই বিদ্যা বেইচ্যা খাবি। সুখে থাকবি। ক' দেহি কোন্ বিদ্যা চাস? নখ-পড়া শিখবি? টেলিভিশনের পর্দায় যেমুন ছবি দেখা যায় তেমুন নখের উপরে ফকফকা কালার ছবি দেখবি। তোর রাশিটা কি? তুলারাশি ছাড়া আবার হয় না।'

'রাশি কি তা তো ফকির মামা জানি না।'

'আইচ্ছা, দেখব নে পরীক্ষা কইরা। তুলারাশি বইল্যা মনে হয় না। তুই বিরাট গাধা। তুলারাশির মধ্যে গাধা হয় না। যাই হউক, তুই চিন্তা করিস না। জবান যখন দিছি তোরে একটা বিদ্যা দিয়া যাব। কোন্ বিদ্যা চাস? বল মুখ ফুইট্যা। শরমের কিছু নাই। শরম নারীর ভূষণ, পুরুষের কলংক।'

'আন্ধাইর মন্ত্র শিখাই দিয়েন।'

'আবে ব্যাটা তুই কস কি? এই মন্ত্র যারে তারে দেওয়া যায় না। বড় কঠিন মন্ত্র। দুই বার এই মন্ত্র পইড়া ডাইন কান্দে একবার ফু, বাঁও কান্দে একবার ফু, বাস, আর দেখা লাগবে না। তুই হবি অদৃশ্য। তুই সবেরে দেখবি, তোরে কেউ দেখব না। তুই হবি অদৃশ্য মানব। এই মন্ত্র যারে তারে দেয়া যায় না — শোন তাহলে একটা গফ — আমার তখন জোয়ান বয়স। বাঁশখালি অঞ্চলের নামকরা চোর মজনু মিয়া এক রাইতে আমার পায়ে আইস্যা পড়ল। দুইটা মন্ত্র চায় — নিদালী মন্ত্র আর আন্ধাইর মন্ত্র। বলে কি — "ফকির সাব, এই দুই মন্ত্র দেন — আর টেকা কি লাগব কন। টেকা কোন বিষয় না।" আমি বললাম, এইটা তো হবে না। এই মন্ত্র যার তার হাতে দেওয়া যায় না। ওস্তাদের নিষেধ আছে। কঠিন নিষেধ।

মজুন মিয়া তখন আমারে ভয় দেখায়। বলে কি — "মন্ত্র না দিলে ফকির সাব আফনের কিন্তু অসুবিধা হবে। আমি সহজ লোক না। আমি জটিল লোক।"

আমি মনে মনে হাসলাম। যার জ্বীনসাধনা তারে ভয় দেখায়। হাতি-ঘোড়া গেল তল পিপিলিকা বলে কত জল। হায় রে বেকুব — পরের ঘটনা বিরাট ইতিহাস।

'ইতিহাসটা কি?'

চান্দ শাহ ফকির উদাস গলায় বলে — সব ইতিহাস শুননের দরকার নাই মোবারক। কাজ কর, কাজ কর। মন দিয়া কাজ করলে তোর গতি করে দিয়ে যাব। চান্দ শাহ ফকির জবান ঠিক রাখে।

'ইতিহাসটা জাননের ইচ্ছা হইতাছে মামা।'

'দিক করিস না মোবারক। কাজ করতে বলছি কাজ কর। গুণীন যারা তারার কথা বলতে হয় কম। কথা বেশি বললে মন্ত্রের জোর কমে। আইজ এক দিনে মেলা কথা বইল্যা ফেলছি। আর না।'

কথা বললে যদি মন্ত্রের জোর কমে তাহলে চান্দ শাহ ফকিরের মন্ত্রে কোন জোর থাকার কথা না। কথা বলার কোন সুযোগই সে নষ্ট করে না। অন্য গ্রামের অচেনা কেউ এলে তো কথাই নেই। এ রকম ঘটনা আজকাল ঘটে না। পীর-ফকির গুণীনের আগের রমরমা নেই।

আগে কি দিন ছিল আর এখন কি দিন! চান্দ শাহ ফকির ছাতিম গাছের নিচে বসে বর্তমান দিনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আগের দিনে কথায় কথায় গুণীন ডাকতো। গুণীন ছাড়া সমাজ ছিল অচল।

পাগলা কুকুরের কামড় ঃ হলুদ পোড়া।
সাপের কাটা ঃ কালো তাগা।
জীনের দৃষ্টি ঃ লোহাপড়া। সোলেমানী তাবিজ।
ভুতের বাতাস ঃ সরিষা পড়া।
পরীর নজর ঃ বাড়ি বন্ধন।
চোরের উপদ্রব ঃ কণ্টক মন্ত্র।
নয়া আবু রাতে ঘুমায় না, চিল্লাফাল্লা করে ঃ আবু নিদালী।

সেই আমলে একটা গুণীনের দিন ভালই চলে যেত। খাওয়া-পরার রমরমা না থাকলেও অনাহারে থাকতে হত না। নতুন ধান উঠলে গুণীনের বাড়িতে এক ধামা ধান পাঠিয়ে দেয়া রেয়াজের মধ্যে ছিল। লাউগাছে দশটা লাউ ফললে একটা লাউ পাঠিয়ে দেও গুনীনের কাছে।

এইসব সভ্যতা-ভব্যতার আজকাল কিছুই নাই। মন্ত্র-তন্ত্রের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। পাগলা কুকুরে কামড় দিলে হলুদ পোড়ার জন্যে তার কাছে আসে না। রোগী নিয়ে সোজা চলে যায় সদরে। নাভির মধ্যে সাত ইনজেকশান। এতে নাকি রোগ আরাম হয়। কি বে-সম্ভব কথা!

চান্দ শাহ্ ফকিরের দিনকাল বড়ই খারাপ যায়। স্ত্রীর কটু কথা মুখ বুঁজে শুনতে হয়। অভাব-অনটনে রোগে ব্যাধিতে ফুলবানুর মাথা থাকে চড়া। কড়া কথা যখন বলে কঠিন করেই বলে। আগে হঠাৎ হঠাৎ বলতো, ইদানীং প্রায় রোজই বলছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ছাতিম গাছের নিচ থেকে ঘরে ঢুকতে আজকাল চান্দ শাহ ফকির আতংকগ্রস্ত হয়। মনে হয়, না জানি কপালে কি আছে।

চান্দ শাহ ফকির রাতে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। বয়সের কারণে

তার ঘুম কমে গেছে। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতেও তার ভাল লাগে না — গল্প করতে ইচ্ছা করে। ফকিরী গল্প। গল্প শুরু করলে ফুলবানু এমন হৈ চৈ শুরু করে যে চান্দ শাহর আফসোসের সীমা থাকে না — কেন সে গল্প শুরু করল! চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলে এই যন্ত্রণা হত না। একে বলে খাল কেটে কুমীর আনা।

আজ রাতেও এ রকম খাল কাটার ব্যাপার ঘটেছে। চান্দ শাহ ফকির মনের আনন্দে খাল কেটে যাচ্ছে। সে তার এক ফকিরী গল্প শুরু করেছে। গল্প বলতে বড় ভাল লাগছে। সে বুঝতেই পারছে না কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাটা খালে কুমীর আসবে। আলিশান কুমীর।

'বুঝলা বউ, তখন আমার যৌবন কাল। তোমার সঙ্গে তখনো বিবাহ হয় নাই। টুকটাক ফকিরি করি। ফকিরের তো আর চব্বিশ ঘণ্টার কাজ না। যখন ডাক পড়ে ফট। বাকি সময় গান-বাজনা করি। যৌবনকালে ঢোল ভাল বাজাইতাম। মন্দিরাও শিখছিলাম। তবে ঢোল হইল মন্দিরার চেয়ে কঠিন বিদ্যা। শুনতেছ বউ?'

'শুনতেছি। বলেন।'

'তখন মুরাদপুর গ্রাম থাইক্যা একটা ডাক পাইলাম। মুরাদপুর গ্রামের বিশিষ্ট জোতদার ইয়াজুদ্দীন হাওলাদার মহিষের গাড়ি পাঠায়ে দিয়েছেন আমাকে নিবার জন্যে। কারণ তাঁর পুত্রবধূর প্রসববেদনা। বউ শুনতেছ? বড়ই চমকপ্রদ কাহিনী।'

'আফনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনতেছি।'

'হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ হইল মৃতবৎসা। মৃতবৎসা বুঝলা তো — সন্তান হয়, আর বাঁচে না। আমার ডাক পড়ছে বিষয় কি দেখার জন্যে। গিয়া দেখি মেলা ডাক্তার-কবিরাজ আছে, আমিও তাদের মধ্যে শামিল হইলাম। হাওলাদার সাহেব বিরাট সম্মান করলেন। হাত ধইরা অন্দরে নিয়া গেলেন। হাঁক-ডাক শুরু করলেন — ফকির সাবেরে পাও ধোয়া, পানি দে, সরবত দে।'

'জামাই আদর।'

'এক সময় আমরার কদর ছিল বউ। জামাই আদরই ছিল — গুণীন তো আর পথে-ঘাটে জন্মায় না। দশ গ্রামে বিশ গ্রামে একটা। যাই হোক, গল্পটা শোন। আমি উঠানে বইস্যা দুই ঝাড়া দিয়া পাইলাম — হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ জ্বীনের সাথে একবার বেয়াদবি করছিল।'

'কি বেয়াদবি?'

'জ্বীন পুসকুনিতে গোসল কইরা পাকপবিত্র হইয়া আসতেছিল, তখন হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ নাক ঝাড়া দিয়া তার গায়ে নাকের সর্দি ফেলছে। তারপর থাইক্যা জ্বীন লাগছে তার পিছনে। অল্প বয়সী চেংড়া জ্বীন — নাম হইল কলিন্দর শাহবাজ। এরার মিজাজ খুবই চড়া থাকে। এই হইল ইতিহাস।'

'আপনে কি করলেন? জ্বীনের শইলের সর্দি মুইছ্যা দিলেন?'

'তা না। জ্বীন তাড়াইলাম। দেশছাড়া করলাম।'

BDeBooks.Com

'এক্কেবারে দেশান্তরী?'

'অবশ্যই। মন্ত্রের তো আমার কাছে অভাব নাই বউ। একটায় কাজ না করলে আরেকটা দেই। কোন কিছুই যখন কাজ করে না তখন আছে কুফুরি কালাম। বড় কঠিন জিনিস। অষুধের মধ্যে যেমন পেনিসিলিন ইনজেকশন — মন্ত্রের মধ্যে তেমন কুফুরি কালাম। পাক কোরানের কালাম উল্টাপাল্টা কইরা পড়তে হয়। বিরাট গুনার কাজ। কিন্তু উপায় কি? গুণীন হইয়া জন্মাইছি গুনা তো করতেই হইবে। রোজ হাশরে এর শক্ত বিচার হবে। আমরা যারা গুণীন আমরার সামনে তোমরা চেলচেলাইয়া বেহেশতে যাইবা। আর আমরা দোজখের আগুনে পুইড়া মরব। এইটাই বিধান।'

চান্দ শাহ ফকির তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে গল্প শেষ করে। বারুদের মত জ্বলে উঠে ফুলবানু।

'এইসব মিথ্যা কথা বইল্যা আফনে মানুষ ঠকান? আফনের লজ্জা নাই?'

ফুলবানু রোগের কথা ভুলে বিছানায় উঠে বসে।। চান্দ শাহ ফকির শংকিত বোধ করে। কাটা খাল বেয়ে কুমীর চলে এসেছে। তাও ছোটখাট কুমীর না, বিরাটাকার কুমীর।

'দুনিয়ার বেবাক মন্ত্র গুইল্যা খাইছেন? বলতে শরম লাগে না?'

চান্দ শাহ ফকির ক্ষীণ গলায় বলল, শরমের কি আছে? শরম নারীর ভূষণ, পুরুষের কলংক।

'শরমের কিছু নাই? তা হইলে মন্ত্রের একটা খেলা দেখান দেখি? নিদালী মন্ত্র পইরা একটা ফু দিয়া আমারে ঘুম পাড়াইয়া দেন। না দিলে আইজ অসুবিধা আছে।'

'রাইত দুপুরে কি চিল্লা ফাল্লা শুরু করলা?'

'হয় মন্ত্রের খেলা আইজ আফনে দেখাইবেন, নয় গলায় গামছা দিয়া কইবেন — মন্ত্র-ফন্ত্র কিছু জানি না। যা বলি সবই মিথ্যা।'

'এইটা যদি স্বীকার পাই তাইলে তো মিথ্যা কথা হয়, মিথ্য বলি ক্যামনে বউ?'

'ওরে বাবা রে, আমার সত্যবাদী রে!'

'বুঝলা বউ, মন্ত্র-তন্ত্রের এই বিদ্যা যারা চর্চা করে মিথ্যা বলা তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ।'

ফুলবানু হাসতে শুরু করে। অপ্রকৃতস্থ মানুষের হাসি। হাসতে হাসতে তার হিক্কা উঠে যায়। চান্দ শাহ ফকির বড় অসহায় বোধ করে। মনে মনে বলে — কি যে যন্ত্রণায় পড়লাম! গল্প শুরু না করলেই হত।

এক শ্রাবণ মাসের মধ্যরাতে ফুলবানুর বুকে তীব্র ব্যথা হল। বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। সমস্ত শরীর তার নীলবর্ণ হয়ে গেল। চান্দ শাহ ফকির স্ত্রীর অবস্থা দেখে অবাক হল। মুখে স্বীকার না করলেও স্ত্রীকে সে অত্যন্ত পছন্দ করে। তার চিৎকার, তার রাগারাগি সবই পছন্দ করে। চান্দ শাহ ফকিরের ইচ্ছা করতে

লাগল চিৎকার করে কাঁদে। গুণীনদের জন্যে চোখের পানি ফেলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ বলে চোখের পানি ফেলতে পারছে না। ফুলবানু স্বামীকে ডেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার মৃত্যুর সময় হইছে। আফনেরে একটা অনুরোধ।

চান্দশাহ বলল, বল বউ কি অনুরোধ। তুমি যা বলবা আমি তাই করব। জ্বীন চালান দিয়া অষুধ আইন্যা দিতেছি। একটু সবুর কর। জ্বীনের রাজধানী হইল কোহকাফ নগর। সেই রাজধানী থাইক্যা অষুধ চইল্যা আসবে।

'আবার মিথ্যা?'

চান্দ শাহ নিঃশ্বাস ফেলল। আগের মত জোর গলায় বলতে পারল না — সে যা বলছে তা মিথ্যা না। ফুলবানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মন্ত্র-তন্ত্র নিয়া আর মিথ্যা ভণ্ডামি কইরেন না। আফনের আল্লাহর দোহাই লাগে।

চান্দ শাহ ধরা গলায় বলল, আচ্ছা যাও করব না।

'মোবারকরে ডাক দিয়া বলেন, সব মিথ্যা। বোকাসোকা মানুষ, একটা আশার মধ্যে আছে। আপনে তারে অদৃশ্য মন্ত্র দিবেন।'

'আচ্ছা, তারে বলতেছি।'

'এখনই বলেন।'

'এত অস্থির হইও না বউ। শান্ত হও।'

'শান্ত পরে হব — আগে আপনে তারে বলেন। আমার সামনে আইন্যা বলেন। নিজের কানে শুনি।'

চান্দ শাহ মোবারককে ডেকে আনলেন। ধরা গলায় বললেন, মোবারক শোন, মন্ত্র-ফন্ত্র আসলে কিছু না। এতদিন তোরে যা বলছি সবই মিথ্যা। বুঝছস?

'জ্বি না।'

ফুলবানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মন্ত্র হইল ধাপ্পাবাজি, বুঝছস? মন্ত্র বইল্যা কিছু নাই। মন্ত্র থাকলে আইজ আমরার এই অবস্থা? খাওন নাই, পিন্দনের কাপড় নাই, রোগে চিকিৎসা নাই। মন্ত্র হইল মিথ্যা।'

'মন্ত্র মিথ্যা মামী?'

'হ রে ব্যাটা মিথ্যা। তুই বেহুদা তর মামার পিছে পিছে ঘুরিস না। কাজ কইরা খা।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'জ্বি আইচ্ছা না। আইজই বিদায় হ — এক্ষণ যা।'

চান্দ শাহ ফকির বিরক্ত গলায় বলল, এক্ষণ যাওয়ার দরকার কি? ধীরে সুস্থে যাইব। ঘরে এমন রোগী, কখন কি দরকার হয়।

ফুলবানু বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, না, হে এক্ষণ যাইব। এক্ষণ। এক্ষণ বিদায় না হইলে আফনে তারেও মন্ত্র শিখাইবেন। হেও হইব আফনের মত ধান্ধাবাজ। তার জীবন কাটব দুঃখে দুঃখে . . .।

'ঠিক আছে, অস্থির হইও না। ব্যবস্থা করতেছি।'

'ব্যবস্থা করা করি না। মোবারকরে বিদায় করেন। টেকা পয়সা যদি কিছু থাকে মোবারকের হাতে দেন। দিয়া বিদায় করেন।'

ফুলবানুকে শান্ত করার জন্যে সেই রাতেই মোবারককে বিদায় করতে হল। ফুলবানুর অস্থিরতা তাতে কমল না। আরো বেড়ে গেল। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তার কষ্ট চোখে দেখা যায় না। চান্দ শাহ ফকিরের চোখে পানি এসে গেল। সে গুণীন মানুষ। গুণীন মানুষের চোখে পানি আসা ভয়ংকর ব্যাপার। মন্ত্রের জোর বলে কিছু থাকে না। কিন্তু সে চোখের পানি সামলাতে পারছে না।

ফুলবানু স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, কানতেছেন ক্যান? পুলাপানের মত চিক্কর দিয়া কান্দন। ছিঃ ছিঃ! মানুষ হইয়া জন্মাইছি, রোগ হইব। ব্যাধি হইব — একদিন মরণ হইব। কান্দনের কি? চউখ মুছেন।

চান্দ শাহ চোখ মুছল। সেই চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভর্তি হয়ে গেল। ফুলবানু অতি কষ্টে শ্বাস টানতে টানতে বলল, আফনে আমার সামনে থাইক্যা যান। আমার সামনে বইস্যা আফনের কষ্ট হইতেছে।

'কই যাব?'

'ছাতিম গাছের তলে গিয়ে বসেন।'

'কি যে তোমার কথা!'

'আমার কথা ঠিক আছে। আপনে যান কইলাম — এক্ষণ যান। শইলডা একটু ভাল বোধ হইলে ডাক দিব।'

'বউ।'

'আবার কথা?'

চান্দ শাহ ফকির হুঁকা হাতে ছাতিম গাছের নিচে বসল। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ উঠেছে। চারদিকে গা ছমছমা আলো। ঘরের ভেতর থেকে ফুলবানুর কাতরানি শোনা যাচ্ছে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চান্দ শাহ ফকিরকে চমকে দিয়ে কে একজন মিষ্টি গলায় ডাকল — ফকির সাব। চান্দ শাহ চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ভয়ে সে অস্থির হয়ে গেল। ফুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। কোত্থেকে আসছে এত মিষ্টি সুবাস?

'কে, কে? কে কথা বলে?'

মিষ্টি গলা আবার শোনা গেল — এওমা, ভয়ে আপনি দেখি আধামরা। যে দিন-রাত জ্বীন-সাধনা, পরী-সাধনার কথা বলে তার এমন ভয় পেলে চলে?

'আপনে কে?'

'আমি পরী।'

চান্দ শাহ হতভম্ব গলায় বলল, পরী বইল্যা দুনিয়ায় কিছু নাই।

'ওমা, আজ দেখি উল্টা কথা।'

'উল্টা না, এইটা সত্য।'

'এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কথা কিভাবে শুনছেন?'

'রোগে-শোকে, অভাবে-অনটনে মনের মধ্যে ধান্ধা লাগছে। ধান্ধার কারণে কথা শুনতেছি। আসলে কিছু না।'

'ভাল করে তাকান। তাকিয়ে দেখেন তো কি ব্যাপার।'

চান্দ শাহ ফকির ভাল করে তাকালো। আরে তাই তো, তার সামনে একটা পরীই তো দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে কিশোরী মেয়েদের মত। শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। পাখা আছে — পাখা দুটা অল্প অল্প কাঁপছে। ফুলের গন্ধ আসছে পরী মেয়েটার গা থেকে। কি অদ্ভুত গন্ধ আর কি সুন্দর মেয়েটার মুখ! পরী ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, দেখলেন?

চান্দ শাহ কিছু বলল না। বলবে কি? সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। পরী আবার কি?

'কি, মুখে দেখি বাক্য নেই। বিনা আগুনে হুক্কা টানছেন। হুক্কায় আগুন দেয়ার কেউ নেই। মোবারক চলে গেছে?'

'জ্বি।'

'ঘরে এমন রোগী, জীবন-মরণ ব্যাপার। আর মোবারক চলে গেল?'

চান্দ শাহ কি বলবে ভেবে পেল না। শরীর বন্ধন মন্ত্রটা কি পড়বে? পড়ে ফেলা দরকার। এই পরী মেয়েটার কাণ্ডকারখানা ভাল ঠেকছে না। যদিও মন্ত্র-তন্ত্র বলে কিছু নেই। নেই-ই বা বলা যায় কি ভাবে? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পাখাওয়ালা পরী। কি আজিব কাণ্ড!

'চান্দ শাহ ফকির।'

চান্দ শাহ জবাব দিল না। শরীর বন্ধন মন্ত্র মনে করার চেষ্টা করতে লাগল —

দোহাই দোহাই
তিন পীর।
কিরপিন সবে নীর॥
লক্ষ্মী ও মনসা।
মা কালী ভরসা।
দিলাম দেহ বন্ধন
রক্ত বর্ণ চন্দন॥
ফুলের নাম জবা।
পশ্চিমে রয় কাবা।
কাবার ঘরে ছয় কুঠুরী . . . .

পরী খিলখিল করে হেসে উঠল। চান্দ শাহ ফকিরের মন্ত্রে গণ্ডগোল হয়ে গেল।

দেহ বন্ধন মন্ত্র দীর্ঘ মন্ত্র। একবার আউলা লেগে গেলে গোড়া থেকে পড়তে হবে।

'চান্দ শাহ ফকির বিড়বিড় করে কি পড়ছেন? মন্ত্র?'

'জ্বি।'

'কি মন্ত্র? দেহ বন্ধন?'

'হুঁ।'

'মন্ত্র-তন্ত্র বলে কিছু আছে?'

'জ্বি না।'

'তাহলে পড়ছেন কেন?'

'আপনে কে?'

'একবার তো বললাম। আবার বলতে হবে? আমি পরী।'

'ও আচ্ছা ।'

'আমি আপনার বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম, আপনার চোখের পানি দেখে নেমে এলাম। কাঁদছিলেন কেন?'

চান্দ শাহ চুপ করে রইল। বলবেই বা কি? বলার মত কোন কথা কি আর আছে।

'শুনুন চান্দ শাহ, আমার হাতে এক্কেবারে সময় নেই। আমি এক্ষুণি চলে যাব। তবে নেমেছি যখন, তখন আপনার একটা ইচ্ছা পূরণ করব। বলুন কি চান? যা চান তাই পাবেন। তবে একটা মাত্র জিনিশ। বলে ফেলুন? এক কলসী সোনার মোহর দিলে হবে? এক কলসীর জায়গায় সাত কলসীও দিতে পারি। তবে ধনদৌলত বেশি হলেও সমস্যা হয়। দেব এক কলসী মোহর?'

'জ্বি না।'

'ধনদৌলত চান না। তাহলে কি চান? সম্মান? লোকজন আপনাকে দেখেই সালাম করবে। যত বড় মানুষই হোক, আপনাকে দেখে উঠে দাঁড়াবে?'

'জ্বি না।'

'বাকি রইল কি — ক্ষমতা। ক্ষমতাও খুব ভাল জিনিশ। ধনদৌলত, সম্মানের চেয়ে ক্ষমতা অনেক মধুর — ক্ষমতা চান?'

'জ্বি না। আপনে ফুলবানুরে ভাল কইরা দেন।'

'উদ্ভট কথা বলেন কি ভাবে। ফুলবানুরে আমি ভাল করব কি ভাবে? আমি কি ডাক্তার — মেডিকেল কলেজের ডিগ্রী আছে আমার? আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে ভেবেছিলাম — এখন তো দেখছি আপনি বোকা। মহা বোকা। ফুলবানু যে দজ্জাল, ভাল হয়ে গেলে আপনকে তো কচলে ফেলবে।'

'কচলাইলেও ক্ষতি নাই।'

'কচলালেও ক্ষতি নেই? তাহলে তো ভাল করে দিতেই হয়। আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি ভাল করে। যান, ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দেখুন। আর আমি বিদায় হচ্ছি।'

পাখির ডানা ঝাপ্টানোর মত শব্দ হল। হতভম্ব চান্দ শাহ ফকিরের চোখের সামনে পরী আকাশে উঠে গেল। পরী চলে গেলেও তার গায়ের গন্ধ এখনো রয়ে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে ফুলবানু ডাকল — এই যে ফকির সাব, শুইন্যা যান।

চান্দ শাহ ঘরে ঢুকে দেখে ফুলবানু খাটে বসে আছে। তার মুখটা হাসি হাসি। চান্দ শাহকে দেখে সে খানিকটা লজ্জা মাখা গলায় বলল, বুকের ব্যথাটা হঠাৎ কইর‍্যা চইল্যা গেছে।

'বল কি?'

'শইলটাও ভাল ঠেকতেছে।'

'হুঁ।'

'দেখেন না নিজে নিজে উইঠ্যা বসছি।'

'হুঁ।'

'পিয়াস লাগছে। এক গ্লাস পানি দেন তো।'

চান্দ শাহ অতি দ্রুত পানি নিয়ে এল। ফুলবানু তৃপ্তির সঙ্গে গ্লাস শেষ করে বলল, হঠাৎ শরীরটা এমন ভাল ঠেকতেছে কেন কিছুই বুঝলাম না।

চান্দ শাহ বলল, ঘটনা তোমারে বলি। বড়ই চমকপ্রদ ইতিহাস। হইছে কি — ছাতিম গাছের নিচে বইসা ছিলাম, হঠাৎ দেখি চোখের সামনে এক পরী। বড় সৌন্দর্য চেহারা। বড় বিউটি।

'চোখের সামনে কি দেখলেন? পরী?'

'হুঁ, পরী।'

'আবার শুরু করছেন? আবার?'

চান্দ শাহ চুপ করে গেল। এমন সুন্দর একটা গন্ধ। এমন এক চমকপ্রদ ইতিহাস কিন্তু সে তার স্ত্রীকে বলতে পারবে না। কোনদিনই বলতে পারবে না। এরচে' দুঃখের ব্যাপার আর কিই বা হতে পারে!

ফুলবানু খাট থেকে নেমেছে। সে হেঁটে হেঁটে দরজা পর্যন্ত গেল। তার বিস্ময়ের সীমা নেই — দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সে নিজে হেঁটে দরজা পর্যন্ত গিয়েছে।

ফুলবানু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপক্ষের মরা জোছনাও তার কাছে অপূর্ব লাগছে। ফুলবানু মুগ্ধ গলায় বলল, জংলা কি ফুল জানি ফুটছে। কি গন্ধ!

ফুলের গন্ধের রহস্যের 'চমকপ্রদ ইতিহাস' চান্দ শাহ ফকির জানে, কিন্তু তার বলার উপায় নেই। সেও এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়াল।

BDeBooks.Com

আয়না

[illegible] শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে [illegible] পানিভর্তি একটা মগ, পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা [illegible] স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে [illegible] শওকত সাহেব মুখ ভর্তি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে [illegible] দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে [illegible] রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে [illegible] হয়। এক সময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

[illegible] এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে [illegible] তার গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে [illegible] শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে [illegible] বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কিনা কে [illegible] ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হল [illegible] কাজ নিয়ে থাকে। কি দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, [illegible] হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কারে দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনো কিনে [illegible] পারেনি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না। আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হল। সে এ বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সে জন্যেই সবসময় এক ধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, মা, ঘরে স্যাভলন আছে?

ইরা বলল, জানি না বাবা।

সে যে রকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সে রকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালমত তাকালোও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী করা। দু'দিকে দুটা বেণী ঝুলছে। দু'টা বেণীতে দু'রঙের ফিতা। একটা লাল একটা শাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দু'টা বিষণ্ন। মেয়েটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হল, হয়ত টুকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা। তাহলে আয়নায় মেয়েটা এল কোত্থেকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন। ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা রোগা ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। পিট পিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কি?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কিভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উল্টো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হল — কি দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভাল লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানান কথা বলতে

হয়। যত না কাজের কথা — তারচে বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কি শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনা কেন? ভাবীর সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি?'

'আজকের শার্টটা তো ভাল পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

'শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।'

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাঙ্কের হিসাব মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসি-হাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হল শওকত সাহেব আরো বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চেংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেননি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তাছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে? কেনই বা করবে? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারপরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মত একটা জিনিশ। হিশাব-নিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এম্নিতেই টেলিভিশন তাঁর ভাল লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন

টিভির মত একটা জিনিশ সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে। যে পর্দায় গান-বাজনা হবে না, শুধু হিসাব-নিকাশ হবে। কোন মানে হয়?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুল হু আল্লা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনকার রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, স্যার, কেমন আছেন?

'ভাল আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন। — আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আচ্ছা।

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কি বলেন স্যার?

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসি-হাসি মুখে বলল, গতকাল যা যা বলেছিলাম সে সব কি স্যার আপনার মনে আছে?

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাট ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কি?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কি সেটা মনে আছে?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমন কিছু জরুরী ব্যাপার না। ম্যাগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম স্মৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেরও তাই। কিছু কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেটা হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেননি। তারপরেও বললেন, বুঝতে পারছি।

'একটা জিনিশ খেয়াল রাখবেন — কম্পিউটার হল আয়নার মত।'

'আয়নার মত?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মত। আয়নাতে যেমন হয় — আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তাই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?'

'হাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হাঁ।'

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এল কি ভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কি? চোখ পিট পিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, স্যার!

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না তো।'

'তাহলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কি ভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না। হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হল আমাদের ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কিভাবে বের করব? . . .

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হল — তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথা ধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তার ভাব ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মত সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন

শওকত সাহেব?

'জ্বি স্যার, ভাল।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'জ্বি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হল?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি — তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিশ শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না?

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলছে। আপনি পারবেন না কেন? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মত কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন — হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জ্বি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি — সারভাইবল্ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না। আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনদিন শিখতে পারবেন না, তাহলে তো কোনদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তাহলে যান।'

'বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মত ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া

আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘন ঘন মাথা ধরছে। চোখ আরো খারাপ করেছে কি না কে জানে। চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নুতন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মত চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেলে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢুকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনো আছে? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! মেয়েটা তো আছে। আগেরবার বসেছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো। গোল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁতির মালা। মালাটা আগে লক্ষ্য করেননি। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, তোমার নাম কি?

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, চিত্রলেখা।

'বাহ, সুন্দর নাম!'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কি বলা যায়? আয়নার ভেতর সে এল কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, আপনার কপালে কি হয়েছে?

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

' খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না?'
'উহুঁ।'
'আয়নার ভেতর তুমি এলে কি করে?'
'তাও জানি না।'
'তোমার বাবা-মা, তারা কোথায়?'
'জানি না।'
'তোমরা মা-বাবা আছেন তো? আছেন না?'
'জানি না।'
'তুমি কি একা থাক?'
'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ্য করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দু'টা হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোন কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?'
'হুঁ, এখানে খুব শীত।'
'তোমার কি গরম কাপড় নেই?'
'না।'
'তোমার এই একটাই জামা?'
'হুঁ।'
'আমাকে তুমি চেন?'
'চিনি।'
'আমি কে বল তো?'
'তা বলতে পারি না।'
'আমার নাম জান?'
'আপনি তো আপনার নাম বলেননি। জানব কিভাবে?'
'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'
'ও আচ্ছা।'
'আমার তিন মেয়ে।'
'ছেলে নাই?'
'না, ছেলে নাই।'
'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?'
'বিয়েবাড়িতে গেছে।'
'কার বিয়ে?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলেনি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কি?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজোটার নাম সোমা, সবচে ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোন মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড় মেয়ের নাম ইরা হলে মেজোটার নাম হয় — মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা . . . '

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেননি কেন?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারো পছন্দ হয়নি।'

'আপনি কি নাম রেখেছিলেন?'

'বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহিয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করেনি। তার মা'র দোষ নেই। পুরানো দিনের নাম তো, এই জন্যে পছন্দ হয়নি।'

'বেগম রোকেয়া কে?'

'তোমাকে বললাম না মহিয়সী নারী। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শুননি?'

'জ্বি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁৎকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোন দরকার নেই। তারা কি না কি মনে করবে — দরকার কি? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না। সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনী স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনী স্যার তাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তারপরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়ত তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভর্তি হতে কত টাকা লাগে কে জানে। টাকা বেশি লাগলে ভর্তি নাও করাতে পারে। হয়ত নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবন্ধ করে রাখবে, কিংবা অন্য কোন দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন

জন্তুর মতই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেননি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।

মাস্টার সাহেব বললেন, আচ্ছা চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হল। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কি কথা বলবেন?

মাস্টার সাহেব বললেন, আপনার গালে কি হয়েছে?

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভাল দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন?'

'ইরার মাকে বলেছি — ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে?'

'ভাল। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান?'

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই — ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে কোন খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন, নিজেকে সামলালেন। কি দরকার?

'মাস্টার সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কিভাবে দেখা যায়?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, কোন বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তাহলে তো তার ছবি দেখার কোন কারণ নেই, তাই না?

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোন কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।'

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কিভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং — চৌদ্দ রকম যন্ত্রণা। তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যে সব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিশ বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নেই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।

শওকত সাহেব বললেন আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কি করে স্যার? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শীট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।

'কি যে স্যার বলেন! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে? চাকরি ছাড়লে খাবেন কি? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোন গল্প জানে না। কোন এক ভদ্রলোক তার কিছু জরুরী ডাটা ভুল করে ইরেজ করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মত জোগাড়। সেই ডাটা কিভাবে উদ্ধার হল তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দু'টা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটার নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম।'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, স্যার আসুন বিসমিল্লাহ বলে লেগে পড়ি।

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, আজ থাক। আজ আর ভাল লাগছে না।

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কি আর করা! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধু শুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিশ দেখ তো।'

শওকত সাহেব ড্রয়ারে থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, জিনিশটা একটু ভাল করে দেখ তো।

'জিনিশটা কি?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, দেখলে?

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, দেখলাম।

'কি দেখলে বল তো?'

'পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে?'

'না, আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনো তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হল তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এই ভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন — ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুঃখী দুঃখী লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছ চিত্রলেখা?

'ভাল।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? মন খারাপ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন?'

'একা একা থাকি তো এই জন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয় ভয় লাগে।'

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর এটা কি? বাক্সের মত?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কি?

'একটা যন্ত্র। হিসাব-নিকাশ করে। আচ্ছা শোন চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন?'

'জানি না তো।'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাক সেখানে কোন খাবার নেই?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কিই বা করতে পারেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোন উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার? আরে, কি আশ্চর্য! তিনি এসব কি ভাবছেন? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টেফিন কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনা মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি? কত দাম এক ছটাক বাদামের? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তারপরই মনে হল বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হল — তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিন ভর্তি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা

করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা . . .

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দুদিন আসবে। পনের শ' টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শ'। মেয়ের এত শখ। তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কি শখ, কি ইচ্ছা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশ' — তের শ'। বাড়তি তের শ' টাকা কোত্থেকে আসবে? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশ' টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কি? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কি, কথা বলছ না কেন?

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

'তোমার সঙ্গে বসে যে দু'টো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম!'

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন —

তুমি বাস কিনা তা আমি জানি না
ভালবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব . . .

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বললে কেমন হয়? কেউ এসে দেখে না ফেললে হল। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

'জ্বি, ভাল আছি। কে গান গাচ্ছে?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা?'

'হ্যাঁ ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে।'

'মনে থাকবে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে — ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন খারাপ। আপনার কি হয়েছে?'

'কিছু হয়নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন খারাপ কেন — আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জান?

'জ্বি না।'

'আচ্ছা শোন, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছ? খিদে কমেছে?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোন কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনি কি যে বলেন! খাব কি করে? আমাদের এখানে কি কোন খাবার আছে?

'খাবার নেই?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ্য করলেন, মেয়েটা আগের মত দুহাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে এসে বটগাছের মত বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কি স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, আর কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমি

আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি — প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোন সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মত পরিষ্কার।

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানটা কাগজে লিখে গেলাম। কোন ঝামলো মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কিভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।'

'শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি ভেবে পেলেন না এ রকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোন সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামী কিছু না, সেই সামর্থ তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশ' টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশ' পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোন কিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভাল ভাল স্যুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। স্যুয়েটার কিনতে তিনশ' চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু স্যুয়েটার গায়ে দিয়েই তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন স্যুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই স্যুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোন কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তারপরেও মনে হল — মেয়েটা দেখবে জিনিশটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক

দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল, ভালই হয়েছে, সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে ভাল লাগে অজানা কোন জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মত তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভাল হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মত আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, বাবা, তুমি কি খুঁজছ?

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এই সব কি বলছিস? কোথায় ফেলেছে?

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এ রকম করছ কেন বাবা?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, কিছু বোঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, তোমার কি হয়েছে বাবা?

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, চিত্রলেখাকে খুজছি রে মা। চিত্রলেখা।

'চিত্রলেখা কে?'

'আমি জানি না কে?'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন — চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায়?

কুদ্দুসের এক দিন

মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস পত্রিকা অফিসে কাজ করে।

বড় কাজ না, ছোট কাজ — চা বানানো, সম্পাদক সাহেবের জন্যে সিগারেট এনে দেয়া। ড্রাইভার গাড়িতে তেল নেবে সঙ্গে যাওয়া, যাতে তেল চুরি করতে না পারে। এই ধরনের টালটু-ফালটু কাজ।

কুদ্দুসের বয়স বাহান্ন। বাহান্ন থেকে ষোল বাদ দিলে থাকে ছয়ত্রিশ। ষোল বছরে মাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর (পুরো পরীক্ষা দিতে পারেনি, ইংরেজি প্রথম পত্র পর্যন্ত দিয়েছিল) গত ছয়ত্রিশ বছর ধরে সে নানান ধরনের চাকরি করেছে। সবই টালটু-ফালটু চাকরি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কিছু দিন সে একটা চোরের অ্যাসিসট্যান্টও ছিল। নিতান্ত ভদ্র ধরনের চোর। সুন্দর চেহারা। স্যুট পরে ঘুরে বেড়াত। শান্তিনিকেতনি ভাষায় কথা বলতো। বোঝার কোন উপায়ই নেই লোকটা বিরাট চোর। কুদ্দুস যেদিন বুঝতে পেরেছে সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে গিয়ে মসজিদের খতিবের মাধ্যমে তওবা করেছে। চোরের সঙ্গে বাস করে চারশ টাকার মত জমিয়েছিল, তার অর্ধেক মসজিদের দানবাক্সে ফেলে দিয়েছে। ইচ্ছা ছিল পুরোটাই দিয়ে দেয়, না খেয়ে থাকতে হবে বলে দিতে পারেনি।

গত ছয়ত্রিশ বছরে যে সব চাকরি কুদ্দুস করেছে তার তুলনায় পত্রিকা অফিসের চাকরিটা শুধু ভাল না, অসম্ভব ভাল। দেশ-বিদেশের টাটকা খবরের সঙ্গে যুক্ত থাকার মত সৌভাগ্য বাংলাদেশের কটা মানুষের আছে? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পড়া যাচ্ছে। এই সৌভাগ্য তো সহজ সৌভাগ্য না, জটিল সৌভাগ্য।

প্রতিদিন সকাল বেলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে নিজের সৌভাগ্যে কুদ্দুস নিজেকেই ঈর্ষা করে। যুবক বয়সে সে একবার গণক দিয়ে হাত দেখিয়েছিল। গণক বলেছিল — শেষ বয়সটা আপনার মহাসুখে কাটবে। বিরাট সম্মান পাবেন। পত্রিকা অফিসে কাজটা পাবার পর কুদ্দুসের ধারণা গণক মোটামুটি সত্যি কথাই বলেছে। শুধু বিরাট সম্মানের জায়গায় একটু ভুল করেছে। তা কিছু ভুল-ত্রুটি তো হবেই।

কুদ্দুস রাতে পত্রিকা অফিসেই ঘুমায়। কোন এক কোনা-কানা খুঁজে নিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ফেললে মশার হাত থেকে মুক্তি। মেস করে থাকতে হচ্ছে না বলে বেশ কিছু টাকা বেঁচে যাচ্ছে। বেতন যা পাওয়া যায় তাতে আলাদা ঘর ভাড়া করে বা মেস করে থাকা সম্ভব না। তার দরকারই বা কি? সে একা মানুষ। এত শৌখিনতার তার দরকার কি? পত্রিকা অফিসে কাজ করতে এসে তার গত তিন বছরে দশ হাজার পাঁচশ' টাকা জমে গেছে। অকল্পনীয় একটা ব্যাপার। টাকাটা পত্রিকার সম্পাদক মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছে জমা আছে। চাইলেই উনি দেন। কুদ্দুসের টাকার কোন দরকার নেই, তবু মাঝে মাঝে মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে টাকগুলি চেয়ে আনে। সারাদিন হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা ফেরত দিয়ে আসে। টাকা হাতে নিরিবিলি বসে থাকতে তার ভাল লাগে। নিজেকে রাজা-বাদশার মত মনে হয়।

আজ সকালে তেমন কোন কারণ ছাড়াই কুদ্দুসের নিজেকে রাজা-বাদশার মত মনে হতে লাগল। সে চায়ের কাপ এবং পত্রিকা হাতে বসেছে। পা নাচাতে নাচাতে কাগজ পড়ছে। মজার মজার খবরে আজ কাগজ ভর্তি। খবরগুলি পড়ে ফেললেই তো মজা শেষ হয়ে গেল, কাজেই কুদ্দুস প্রথমে শুধু হেড লাইনে চোখ বুলাবে। ভেতরের ব্যাপারগুলি ধীরে সুস্থে পড়া যাবে। তাড়া কিছু নেই। সম্পাদক সাহেব চলে এসেছেন। তাঁকে প্রথম দফার চা দেয়া হয়েছে, তিনি ঘন্টাখানিকের ভেতর আর ডাকবেন না। কুদ্দুস শিস দিয়ে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করতে লাগল — পাগল মন . . . । গানটা খুব হিট করেছে।

কুদ্দুস পত্রিকার তিন নাম্বার পাতাটা খুলল। "আজকের দিনটি কেমন যাবে" তিন নম্বর পাতায় ছাপা হয়। কুদ্দুস এই অংশটা প্রথম পড়ে। তার ধনু রাশি। তার ব্যাপারে "আজকের দিনটি কেমন যাবে"তে যা লেখা হয় সব মিলে যায়। একবার লেখা হল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। সেদিন অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুড়ো আঙুলের নখের অর্ধেকটা ভেঙে গেল।

আজকের রাশিফলে লেখা —

ধনু রাশির জন্যে আজ যাত্রা শুভ। ভ্রমণের যোগ আছে। কিঞ্চিত অর্থনাশের আশঙ্কা। শত্রুপক্ষের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর কারণে সম্মানহানির আশঙ্কা।

সম্মানহানির আশংকায় কুদ্দুস খানিকটা চিন্তিত বোধ করছে। সম্মান বলতে গেলে কিছুই নেই। যা আছে তাও যদি চলে যায় তো মুশকিল। পত্রিকার সব হেড লাইন শেষ করবার আগেই কুদ্দুসের ডাক পড়ল। মতিয়ুর রহমান সাহেবের ইলেকেট্রিক বেল ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। কুদ্দুস এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে তার কাপ থেকে চা পুরোটা ছলকে গায়ে পড়ে গেল। শার্টটা নুতন কেনা। আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার পরা হয়েছে। শাদা কাপড়ে চায়ের রঙ সহজে ওঠে না। এক্ষুণি ধুয়ে ফেলতে পারলে হত। সেটা সম্ভব না। মতিয়ুর রহমান স্যার ডেকেছেন। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা যাবে না। কুদ্দুস প্রায় ছুটে সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকল।

মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, তোর খবর কি রে কুদ্দুস?

কুদ্দুস বিনয়ে মাথা নিচু করে বলল, খবর ভাল স্যার।

'একটা কাজ করে দে তো — এই চিঠিটা নিয়ে যা। নাম-ঠিকানা লেখা আছে। হাতে হাতে দিয়ে আসবি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'জাভেদ সাহেব ইস্টার্ন প্লাজার নয় তলায় থাকেন। ইস্টার্ন প্লাজা চিনিস তো?'

'জ্বি স্যার, চিনি।'

'খুবই জরুরী চিঠি। হাতে হাতে দিবি। উনাকে বলবি আমাকে টেলিফোন করতে। আমি অফিসেই থাকব। নে টাকাটা নে, রিকশা করে চলে যা।'

মতিয়ুর রহমান সাহেব কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে কুদ্দুসের হাতে দিলেন। কুদ্দুস টাকা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হল। রওনা হবার আগে শার্টটা পানি দিয়ে একবার ধুয়ে ফেলতে হবে। কতক্ষণের মামলা? কুদ্দুস বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, আবার মতিয়ুর রহমান সাহেবের বেল বেজে উঠল। আবারও কুদ্দুস ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। সম্পদাক সাহেবের ঘরে ঢুকলে কুদ্দুসের মাথা ঠিক থাকে না।

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'রিকশায় যাওয়ার দরকার নেই, দেরি হবে। তুই এক কাজ কর, আমার গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

রিকশা ভাড়ার টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কুদ্দুস কুড়ি টাকার নোটটা বের করল। মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, টাকা ফেরত দিতে হবে না। তুই দেরি করিস না। চলে যা।

শার্ট না ধুয়েই কুদ্দুস গাড়িতে উঠল। তার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। শার্টের এই রঙ তো আর উঠবে না। নতুন শার্ট। মাত্র তিনবার পরা হয়েছে। গাড়িতে উঠে তার আরেকটু মন খারাপ হল — আবার একটা ভুল করা হয়েছে। পত্রিকাটা সাথে

নিয়ে এলে হত। গাড়িতে যেতে যেতে কাগজ পড়ার আলাদা একটা মজা আছে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনার গরম খবর আছে। আজকের দিনটা ভুল দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকের তারিখটা কত যেন? ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৬, তারিখটা তার জন্যে শুভ না।

লিফটে কুদ্দুস একা। লিফটম্যান তাকে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে বলেছে — আট তলায় গিয়ে থামবে। নেমে যাবেন। পারবেন না? কুদ্দুস বলেছে, পারব। তার কথা শেষ হবার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। লিফ্‌ট চলছে না। স্থির হয়ে আছে। একটা লালবাতি জ্বলছে আর নিভছে। মাথার উপর শাঁশাঁ শব্দে ফ্যান ঘুরছে। অদ্ভুত ফ্যান। গায়ে কোন বাতাস লাগছে না। লিফটের ভেতর বিরাট একটা আয়না লাগানো। আয়নার দিকে তাকিয়ে কুদ্দুসের মন খারাপ হয়ে গেল। শার্টের দাগ বিশ্রীভাবে দেখা যাচ্ছে। এখন লন্ড্রিতে দিয়েও লাভ হবে না। টাকা খরচ হবে অথচ দাগ উঠবে না। আচ্ছা, লিফট্‌টা চলছে না, ব্যাপারটা কি? লিফটম্যান মনে হয় শুধু দরজা বন্ধ করার বোতাম টিপেছে, উপরে উঠার বেতাম টিপতে ভুলে গেছে। সে কি সাত লেখা বোতামটা টিপবে? কুদ্দুস মনস্থির করতে পারছে না। এ কি বিপদে পড়া গেল! আগে জানলে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে যেত। আট তলায় ওঠা এমন কোন ব্যাপার না।

পাগল মন গানটার প্রথম লাইনটা কুদ্দুস মনে মনে কয়েকবার গাইল। ইচ্ছে করলে শব্দ করেও গাইতে পারে। লিফটে সে একা। লিফটের ভেতর গান গাইলে কি বাইরে থেকে শোনা যায়?

হোঁস করে একটা শব্দ হয়ে লিফটের ভেতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি কি চলে গেল? কুদ্দুসের বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। ঢাকা শহরে কারেন্টের কোন ঠিকঠিকানা নেই। একবার চলে গেলে কখন আসবে কে জানে। লিফেটের ভেতর কতক্ষণ থাকতে হবে? লিফটম্যান যে গেছে তারও ফেরার নাম নেই। কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজ-খবর করবে না? এডমিনিস্ট্রেশন ভাল না। মতিয়ুর রহমান স্যারের হাতে পড়ত — এক প্যাঁচে ঠিক করে দিত।

কুদ্দুস খুব সাবধানে লিফটের দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিতে সাহসে কুলুচ্ছে না। কল-কব্জার কারবার — কি থেকে কি হয় কে জানে? গরম লাগছে। আবার দমবন্ধও লাগছে। কুদ্দুস বেশ উঁচু গলায় ডাকল, লিফটম্যান ব্রাদার, হ্যালো! হ্যালো!

কতক্ষণ পার হয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। কুদ্দুসের মনে হল ঘণ্টাখানিকের কম না। বেশিও হতে পারে। সারাদিনে যদি কারেন্ট না আসে তাহলে কি হবে? লিফটের ভেতর থাকতে হবে? কুদ্দুস লিফটের দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিল আর তাতেই লিফট চলতে শুরু করল। কারেন্ট ছাড়াই কি চলছে? লিফটের ভেতরটা

ঘোর অন্ধকার। কারেন্ট এলে তো বাতি-ফাতি জ্বলত। কিছুই জ্বলেনি। কুদ্দুস মনে মনে বলল, চলুক, কারেন্ট ছাড়াই চলুক। চলা দিয়ে হচ্ছে কথা।

শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। কুদ্দুসের শরীর কাঁপছে। লিফট কি এত দ্রুত ওঠে? এ তো মনে হচ্ছে বাড়িঘর ফুঁড়ে আসমানে উঠে যাবে। এত দ্রুত লিফট উঠছে যে কুদ্দুসের পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। যে ভাবে উঠছে তাতে ১০০ তলা ছাড়িয়ে যাবার কথা। এটা মাত্র বার তলা বিল্ডিং। কুদ্দুস আসহাবে কাহাফের আটটা নাম মনে করার চেষ্টা করছে। এদের নাম পড়ে বুকে ফুঁ দিলে মহা বিপদ দূর হয়। বহু পরীক্ষিত। এরা আটজন দাকিয়ানুস বাদশাহর সময়ে পর্বতের গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এরা ঘুমন্ত থাকবে। এদের সাতজন মানুষ, একটা কুকুর। সাতজন মানুষের নাম মনে পড়ছে, কুকুরটার নাম মনে পড়ছে না।

মাকসেলাইনিয়া
মাসলিনিয়া
ইয়ামলিখা
মারনুশ
দাবারনুশ
শযনুশ
কাফশাততাইউশ

কুকুরটার নাম কি?

কুকুরের নাম মনে করতে না পারলে কোন লাভ হবে না। কুকুরের নামশুদ্ধ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। কুদ্দুস প্রাণপণে কুকুরটার নাম মনে করার চেষ্টা করছে। চরম বিপদে কিছুই মনে পড়েনা।

শোঁ শোঁ শব্দ বাড়ছেই। শব্দটা এখন কানের পর্দার ভেতরে হচ্ছে। কুদ্দুসের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে লিফটের মেঝেতে বসে পড়ল। আর তখনই কুকুরটার নাম মনে পড়ল — কিতমীর!

কিতমীর নাম পড়ার পরপরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে লিফট থেমে গেল। লিফটের দরজা খুলতে শুরু করল। দরজা পুরোপুরি খোলার জন্যে কুদ্দুস অপেক্ষা করল না। সে বসা অবস্থা থেকেই ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়ল। বের হয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। সে কোথায় এসেছে? ব্যাপারটা কি? লিফট থেকে বের হওয়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। যে ভাবে লাফ দিয়ে সে লিফট থেকে বের হয়েছে তার উচিত ঠিক একইভাবে লাফ দিয়ে আবার লিফটে ঢুকে যাওয়া। সে পেছনে তাকালো। পেছনে লিফট নেই। লিফট কেন কোন কিছুই নেই, চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। সে নিজেও বসে আছে শূন্যের উপর। মাথার উপর আকাশ থাকার কথা।

আকাশ-ফাকাশ কিচ্ছু নেই। তার চারপাশে কুয়াশার মত হালকা ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার রঙ ঈষৎ গোলাপী। কুদ্দুস মনে মনে বলল, ইয়া গাফুরুর রাহিম! এ কি বিপদে পড়লাম! ও আল্লাপাক, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। হে গাফুরুর রাহিম! একবার যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাই তাহলে শুক্রবারে তারা মসজিদে সিন্নি দেব। এবং বাকি জীবনে আর লিফটে চড়ব না। দরকার হলে ৫০০ তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠব। আমার উপর দয়া কর আল্লাহপাক।

কুদ্দুস চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে তিনবার কুলহুআল্লাহ পড়ে বুকে ফুঁ দেবে। তারপর চোখ খুলবে। তাতে যদি কিছু হয়। কোন দোয়াই প্রথম চোটে মনে পড়ছে না। হায়, এ কেমন বিপদ!

২

কুদ্দুস চোখ খুলল। অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে চারপাশে ছিল গোলাপী রঙের ধোঁয়া, এখন বেগুনী ধোঁয়া। আগে কোন শব্দ ছিল না। এখন একটু পর পর সাপের শিসের মত তীব্র শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শরীরের ভেতর ঢুকে কলজে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এরচে তো আগেই ভাল ছিল। কুদ্দুস ভেবে পাচ্ছে না সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলবে কি না। চোখ বন্ধ রাখা আর খোলা রাখা তো একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে সে মারা গেছে? হার্টফেল করে লিফটের ভেতরেই তার মৃত্যু হয়েছে? সে যে জগতে আছে সেটা আর কিছুই না, মৃত্যুর পরের জগৎ। এ রকম তো হয়। কিছু বোঝার আগেই কত মানুষ মারা যায়। সেও মারা গেছে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জিন্দা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর মানকের-নেকের আসবে, তাকে সোয়াল-জোয়াব শুরু করবে — "তোমার ধর্ম কি?" "তোমার নবী কে?" এইসব জিজ্ঞেস করবে। এ কি বিপদ!

'তুমি কে?'

কুদ্দুস চমকে চারদিকে তাকালো, কাউকে সে দেখতে পেল না। প্রশ্নটা সে পরিষ্কার শুনলো। তাকেই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে। কেমন গম্ভীর ভারি গলা। শুনলেই ভয় লাগে।

"এই, তুমি কে?"

কুদ্দুস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্যার, আমার নাম কুদ্দুস।

'তুমি এখানে কি ভাবে এসেছ?'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না। লিফটের ভিতরে ছিলাম। লাফ দিয়ে বের হয়েছি। বাইর হওয়া উচিত হয় নাই। আপনে স্যার এখন একটা ব্যবস্থা করেন। গরীবের একটা রিকোয়েস্ট।'

'আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি এখানে এলে কি করে?'

'স্যার, আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন। কোথায় আসছি নিজেও জানি না। কিভাবে আসছি তাও জানি না। লিফটের দরজা ভালমত খোলার আগেই লাফ দিয়েছিলাম। এটা স্যার অন্যায় হয়েছে। আর কোনদিন করব না। সত্যি কথা বলতে কি — আর কোনদিন লিফটেও চড়ব না। এখন স্যার ফেরত পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করেন। আমি খাস দিলে আল্লাপাকের কাছে আপনার জন্যে দোয়া করব।'

'তোমার কোন কিছুই তো আমরা বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হল — মাত্রা কি করে ভাঙলে? মাত্রা ভেঙে এখানে এলে কি ভাবে?'

'স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কোন কিছুই ভাঙি নাই। যদি কিছু ভেঙে থাকে আপনাআপনি ভাঙছে। তার জন্যে স্যার আমি ক্ষমা চাই। যদি বলেন, পায়ে ধরব। কোন অসুবিধা নাই।'

'তুমি তো বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছ। তুমি কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কি ঘটেছে?'

'জ্বি না।'

'তুমি ত্রি-মাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করেছ। এই কাণ্ডটা কি ভাবে করেছ আমরা জানি না। আমরা জানার চেষ্টা করছি।'

'স্যার, ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

'তোমার কথাবার্তাও তো আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। গোলাম হয়ে থাকব মানে কি?'

কুদ্দুস ব্যাকুল গলায় বলল, স্যার, গোলাম হয়ে থাকব মানে হল স্যার আপনার সার্ভেন্ট হয়ে থাকব। আমি আপনার মুখ দেখতে পারছি না। মুখ দেখতে পারলে ভয়টা একটু কমত।'

'আমরা ইচ্ছা করেই তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি না। মুখ দেখালে ভয় আরো বেড়ে যেতে পারে।'

'স্যার, যে ভয় লিফটের ভিতর পেয়েছি, এরপর আর কোন কিছুতেই কোন ভয় পাব না। রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার ভেতর ঢুকে রয়েল বেঙ্গলকে চুমু খেয়ে আসব। তার লেজ দিয়ে কান চুলকাব, তাতেও স্যার ভয় লাগবে না।'

'তোমার নাম যেন কি বললে — কুদ্দুস?'

'জ্বি স্যার, কুদ্দুস।'

'একটা জিনিশ একটু বোঝার চেষ্টা কর — তুমি হচ্ছ ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ। তোমাদের জগতের প্রাণীদের দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটি মাত্রা আছে। এই দেখে তোমরা অভ্যস্ত। আমরা চার মাত্রার প্রাণী। চার মাত্রার প্রাণী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই।'

'স্যার, আপনি আমার মত বাংলা ভাষায় কথা বলতেছেন, এইটা শুনেই মনে

আনন্দ পাচ্ছি। আপনার চেহারা যদি খারাপও হয়, কোন অসুবিধা নাই। চেহারার উপর তো স্যার আমাদের হাত নাই। এটা হল বিধির বিধান।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে দেখ।'

কুদ্দুসের শরীরে হালকা একটা কাঁপুনি লাগল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে যে রকম লাগে, সে রকম। তারপরই মনে হতে লাগলো তার চারপাশে যত বেগুনী রঙ আছে সব তার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আবার চোখের ভেতর থেকে কিছু কিছু রঙ বের হয়ে আসছে। এ কি নতুন মুসিবত হল!

আচমকা রঙের আসা-যাওয়া বন্ধ হল। কুদ্দুস তার চোখের সামনে কি একটা যেন দেখল। মানুষের মতই মুখ, তবে স্বচ্ছ কাচের তৈরি। একটা মুখের ভেতর আরেকটা, সেই মুখের ভেতর আরেকটা — এই রকম চলেই গিয়েছে। মুখটার চোখ দুটাও কাচের। সেই চোখের যে কোন একটার দিকে তাকালে তার ভেতরে আর একটা চোখ দেখা যায়, সেই চোখের ভেতর আবার আরেকটা . . . ঘটনা এইখানে শেষ হলে হত, ঘটনা এইখানে শেষ না। কুদ্দুসের কখনো মনে হচ্ছে সে ভয়ংকর এই মানুষটার ভিতরে বসে আছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ভয়ংকর এই মানুষটা তার ভেতরে বসে আছে। এই কুৎসিত জিনিশটাকে মানুষ বলার কোন কারণ নেই, মানুষ ছাড়া কুদ্দুস তাকে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'জ্বি না, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন — একটু পেসাব করব, পেসাবের বেগ হয়েছে।'

'কি করবে?'

'প্রস্রাব করব। আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না — কি করতে চাও?'

'স্যার, একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন। তুমি তো আমাদের মহা সমস্যায় ফেললে। আমাদের এখানে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই।'

'বলেন কি স্যার!'

'আমরা দেহধারী প্রাণী নই। দেহধারী প্রাণীদের মত আমাদের খাদ্যের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি টয়লেটেরও প্রয়োজন নেই। এখন তুমি টয়লেটে যেতে চাচ্ছ, আমাদের ধারণা কিছুক্ষণ পর তুমি বলবে খিদে পেয়েছে।'

'সত্যি কথা বলতে কি স্যার, খিদে পেয়েছে। সকাল বেলা নাসতা করি নাই। মারাত্মক খিদে লেগেছে। চক্ষুলজ্জার জন্যে বলতে পারি নাই। সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়েক চুমুক চা শুধু খেয়েছি, পত্রিকাও পড়া হয় নাই — আপনাদের এখানে পত্রিকা আছে স্যার?'

'না, পত্রিকা নেই।'

BDeBooks.Com

'জায়গা তো তাহলে খুব সুবিধার না।'

'আমাদের জায়গা আমাদের মত, তোমাদের জায়গা তোমাদের মত।'

'আপনাদের তাহলে "ইয়ে" হয় না?'

'ইয়ে মানে কি?"

'পেসাব-পায়খানার কথা বলতেছি — বর্জ্য পদার্থ।'

'না, আমাদের এই সমস্যা নেই। তোমাকে তো একবার বলা হয়েছে আমরা তোমাদের মত দেহধারী না। শুধু দেহধারীদেরই খাদ্য লাগে। খাদ্যের প্রশ্ন যখন আসে তখনই চলে আসে বর্জ্য পদার্থের ব্যাপার।'

'তবু স্যার, আমার মনে হয় বাইরের গেস্টদের জন্য দুই-তিনটা টয়লেট বানিয়ে রাখা ভাল।'

'দেহধারী কোন অতিথির আমাদের এখানে আসার উপায় নেই।'

'আপনি তো স্যার একটা মিসটেক কথা বললেন। আমি চলে এসেছি না?'

'হ্যাঁ, তুমি চলে এসেছ। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিভাবে এসেছ সেই রহস্য এখনো ভেদ করা সম্ভব হয়নি।'

'স্যার বিশ্বাস করেন, নিজের ইচ্ছায় আসি নাই। যে দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই, পেসাব-পায়খানার উপায় নাই, সেই দেশে খামাখা কি জন্যে আসব বলেন? তাও যদি দেখার কিছু থাকত, একটা কথা ছিল। দেখারও কিছু নাই। স্যার, আপনাদের সমুদ্র আছে?'

'হ্যাঁ আছে। তবে সে সমুদ্র তোমাদের সমুদ্রের মত না। আমরা সময়ের সমুদ্রে বাস করি। তোমাদের কাছে সময় হচ্ছে নদীর মত বয়ে যাওয়া। আমাদের সময় নদীর মত প্রবহমান নয়, সমুদ্রের মত স্থির।'

'মনে কিছু নেবেন না স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারি নাই।'

'সময় সম্পর্কিত এই ধারণা ত্রি-মাত্রিক জগতের প্রাণীদের পক্ষে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। অংক এবং পদার্থবিদ্যায় তোমার ভাল জ্ঞান থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'এটা বলে স্যার আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি খুবই মূর্খ। অবশ্য স্যার মূর্খ হবার সুবিধাও আছে। মূর্খদের সবাই স্নেহ করে। বুদ্ধিমানদের কেউ স্নেহ করে না। ভয় পায়। মতিয়ুর রহমান স্যার যে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে তার কারণ একটাই — আমি মূর্খ। বিরাট মূর্খ।'

'ও আচ্ছা।'

'উনার স্ত্রীও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। গত ঈদে আমাকে পায়জামা আর পাঞ্জাবি দিলেন। পাঞ্জাবি সিল্কের। এই রকম সিল্ক সচরাচর পাওয়া যায় না, অতি মিহি — এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সিল্ক। যা তৈরি হয় সবই বিদেশে চলে যায়। ওনাদের কানেকশন ভাল বলে এইসব জিনিশ যোগাড় করতে পারে। যাই হোক, পাঞ্জাবি

সাইজে ছোট হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর উনাকে বলি নাই, মনে কষ্ট পাবেন। শখ করে একটা জিনিশ কিনেছেন।'

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে।'

'এই যে স্যার বললাম — মূর্খদের সবাই পছন্দ করে। আপনারা বেশি জ্ঞানী, কেউ আপনাদের পছন্দ করবে না। সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আপনাদের ভয়ে আমি অস্থির। আপনাদের দিকে তাকাতেও ভয় লাগতেছে।'

'ভয়ের কিছু নেই আমরা তোমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।'

'আপনাদের পা থাকলে স্যার ভাল হত। আপনাদের পা ছুঁয়ে সালাম করতাম।'

'তোমার প্রতি আমাদের মমতা হয়েছে যে কারণে আমরা এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার নিজের জায়গায় যখন ফিরবে তখন তোমার জীবন আনন্দময় হবে।'

'বললে হয়তো স্যার আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি খুব আনন্দে আছি।'

'আনন্দে থাকলেও তোমার জীবন মোটামুটিভাবে অর্থহীন এটা বলা যায়। জীবন কাটাচ্ছ অন্যের জন্যে চা বানিয়ে।'

'কি করব স্যার বলেন, পড়াশোনা হয় নাই, মেট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে বাবাকে সাপে কাটল। চোখের সামনে ধড়ফড় করতে করতে মৃত্যু।'

'আমরা কি করছি মন দিয়ে শোন, তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে। তুমি সেখান থেকে জীবন শুরু করবে। বাবাকে যাতে সাপে না কাটে সেই ব্যবস্থা করবে।'

'সেটা স্যার কি করে সম্ভব?'

'সময় আমাদের কাছে স্থির। আমরা তা পারি। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন এখনকার স্মৃতি তোমার থাকবে না। তবে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে এই ব্যাপারটা তোমার মনে থাকবে। এটা যাতে মনে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। নতুন জীবন তোমার শুরু হচ্ছে। সেখানে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে না। তোমার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু উন্নত করে দিচ্ছি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেবে।'

'অংকটা নিয়ে স্যার সমস্যা। অংকটা পারি না। খুব বেড়াছেড়া লাগে।'

'আর বেড়াছেড়া লাগবে না।'

'এখন কি স্যার আমি চলে যাচ্ছি?'

'কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছ।'

'ম্যাডামকে আমার সালাম দিয়ে দেবেন। উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।'

'ম্যাডামকে তোমার সালাম পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে আগে একবার বলেছি আমরা দেহধারী নই। আমাদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন ব্যাপার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা। না থাকলে কি আর করা! সবই আল্লাহর হুকুম। একটু দোয়া রাখবেন স্যার। এই বিপদ থেকে কোনদিন উদ্ধার পাব চিন্তা করি নাই।'

কুদ্দুস হঠাৎ তার বুকে একটা ধাক্কার মত অনুভব করল। গভীর ঘুমে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হচ্ছে সে যেন অতল কোন সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই সমুদ্রের পানি শিসার মত ভারি, বরফের মত ঠাণ্ডা। পানির রঙ গাঢ় গোলাপী। সে তলিয়েই যাচ্ছে। তলিয়েই যাচ্ছে। এই সমুদ্রের কি কোন তলা নেই? না-কি এখন সে মারা যাচ্ছে?

কুদ্দুসের ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না। অথচ তার ইচ্ছা জেগে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার কি হচ্ছে দেখে।

৩

কুদ্দুসের ঘুম ভেঙেছে।

সে তার গ্রামের বাড়িতে চৌকির উপর বই-খাতা মেলে পড়তে বসেছিল। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কি সর্বনাশের কথা! কাল ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা। রচনা এখনো দেখা হয়নি। অ্যা জার্নি বাই বোট এই বছর আসার কথা। গত বছর আসেনি। কুদ্দুস রচনা বই টেনে নিল। আর তখন মনে হল তাকে একটা সাপ মারতে হবে। সাপটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে। ভয়ংকর বিষধর একটা সাপ। এ রকম মনে হবার কি কারণ কুদ্দুস বুঝতে পারল না। তারপরেও সে হ্যারিকেন হাতে নেমে এল। একটা মোটা লাঠি দরকার। লাঠি হাতে এক্ষুণি তাকে তার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হাতে একটুও সময় নেই।

কেউ একজন তাকে বলছে — তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। সেই কেউ-একজনটা কে? কুদ্দুস জানে না। শুধু জানে এক্ষুণি একটা সাপ তার বাবাকে ছোবল দিতে আসবে। তার দায়িত্ব সাপটাকে মারা। যদি মারতে পারে তবেই তার জীবন হবে অন্য রকম।

কুদ্দুস তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ঐ তো সাপটা। শঙ্খচূড় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হ্যারিকেনের আলোয় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

ভাইরাস

[illegible] একজন সুখী মানুষ।

[illegible] সাত বছর হল রিটায়ার করেছেন। [illegible] একসঙ্গে বেশ কিছু [illegible] ইন্টারেস্ট যা পান তাতেই তার [illegible] হয়। স্বাস্থ্য ভাল, বেশ কাবু নেই। ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, [illegible] এই জাতীয় বৃদ্ধ বয়সের রোগের কোন কিছুই তাঁকে এখনো ধরেনি। [illegible] ভাল বিয়ে দিয়েছেন। একজন বরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, অন্যজন [illegible] গত হয়েছেন। নুরুজ্জামান সাহেব একা থাকেন। এই একটাই যা সমস্যা। এবং অনেকদিন থেকেই একা আছেন বলে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার খারাপ লাগে না, বরং ভালই লাগে। দিনের বেলাটা তিনি ঘুরে ঘুরেই কাটান। দুপুরে নিরিবিলি দেখে কোন একটা হোটেলে খেয়ে নেন। ভিড়ভাট্টা তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। রাতে কিছু খান না। কোনদিন একটা কলা, কোনদিন একটা আপেল খেয়ে শুয়ে পড়েন। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেন।

আশ্বিন মাসের এক দুপুর। বেলা প্রায় দু'টা। নুরুজ্জামান সাহেব লালবাগের কেল্লা দেখে একটা হোটেলে ভাত খেতে ঢুকেছেন। হোটেলের নাম দিল্লী রেস্টুরেন্ট। দিল্লী রেস্টুরেন্টের পাশেই আরেকটা হোটেল — 'হোটেল আমানিয়া'। সেখানে

রমরমা ভিড়। দিল্লী রেস্টুরেন্ট একেবারেই ফাঁকা। মনে হয় এই হোটেলের খাবার-দাবার সুবিধার না। নুরুজ্জামান সাহেবের কাছে খাবারটা প্রধান না, নিরিবিলিটা প্রধান। কাজেই তিনি ঢুকেছেন দিল্লী রেস্টুরেন্টে। কোণার দিকের অন্ধকারের একটা টেবিলে বসেছেন। ইলিশ মাছ, সবজি এবং ডালের অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সাধারণত তিনি মাছ খান না। আজ কেন জানি মাছ খেতে ইচ্ছা করল। তখন হোটেলে আরেকজন কাস্টমার ঢুকল। এত ফাঁকা জায়গা থাকতে নুরুজ্জামান সাহেবের কাছে এসে বলল, আপনার টেবিলে বসতে পারি?

নুরুজ্জামান সাহেব না বলতে গিয়েও বললেন না। হোটেলটা তাঁর না। কাস্টমার এসেছে, পয়সা দিয়ে খাবে। তার যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবে। নুরুজ্জামান সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারো সামনে খাওয়া-দাওয়া করতে তাঁর ভাল লাগে না।

'আশা করি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করছি না।'

'জ্বি না।

'একটা দেয়াশলাই দিতে পারেন?'

নুরুজ্জামান সাহেব দেয়াশলাই বের করে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর মন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে — বোঝাই যাচ্ছে এই লোক প্রচুর কথা বলবে । বক বক করে মাথা ধরিয়ে দেবে। এখনো সময় আছে, তিনি ইচ্ছে করলে অন্য টেবিলে চলে যেতে পারেন। কাজটা অভদ্রতা হয়।

'আশা করি সিগারেটের ধোঁয়ায় আপনার অসুবিধা হচ্ছে না।'

'না, হচ্ছে না।'

'আন্তরিক ধন্যবাদ।'

লোকটার অন্য কোন মতলব নেই তো? ধান্ধাবাজ না তো? বাংলাদেশে ধান্ধাবাজ লোকের কোন অভাব নেই। কয়েকদিন আগেই এরকম একজন ধান্ধাবাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইস্ত্রী করা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে রীতিমত ভদ্রলোক। চোখে সোনালী রিমলেস চশমা। মুখ ভর্তি হাসি। নুরুজ্জামান সাহেব একটা হোটেলে খেতে বসেছেন, লোকটা তাঁর সামনে বসে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না। গুলিস্তানের মোড়ে আমার মানিব্যাগটা চুরি হয়েছে। খিদেয় মরে যাচ্ছি। চারটি ভাত খাওয়ান।

এরকম সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষের মুখের উপর 'না' করা মুশকিল। লোকটা ভাত খেল। ভাত খাওয়ার পর দৈ, মিষ্টি খেল। সবশেষে মিষ্টি পান এবং একটা বেনসন সিগারেট।

নুরুজ্জামান সাহেবকে কিছু বলতে হচ্ছে না, সে নিজেই হাসিমুখে অর্ডার দিচ্ছে। কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। কি সুন্দর করে বলছে —

'স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট দিতে বলি। এমন চমৎকার

লাঞ্চের পর সিগারেট না খেলে লাঞ্চটার অপমান করা হয় — এই বেয়ারা, একটা বেনসন নিয়ে এসো। দেখে শুনে আনবে, ড্যাম্প যেন না হয়। ড্যাম্প হলে থাবড়া খাবি।'

এই লোকও সে রকম কেউ না তো? নুরুজ্জামান আড় চোখে তাকালেন। সে রকমই তো মনে হচ্ছে। অন্ধকার কোণায় এসে বসেছে, চোখে সানগ্লাস। চোখ থেকে সানগ্লাস খোলেনি। একবার রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছিলেন — যারা সহজে সানগ্লাস খুলতে চায় না তাদের ভেতর সমস্যা থাকে। লোকটা পোশাকে-আশাকে ভাল। খয়েরি রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। শাদা প্যান্ট। শাদা প্যান্টের সঙ্গে মিলিয়ে ধবধবে শাদা চামড়ার জুতা। বিদেশী জুতা নিশ্চয়ই। সিগারেট যে খাচ্ছে দামী সিগারেটই খাচ্ছে। সুন্দর গন্ধ আসছে। সস্তা সিগারেটের দম আটকানো গন্ধ না। সিগারেট বের করেছে সিগারেট-কেস থেকে। আজকাল অবশ্যি কেউ সিগারেট কেস ব্যবহার করে না। লোকটা সিগারেট-কেস নুরুজ্জামান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিল। নিচু গলায় বলল,

'আপনি কি সিগারেট খাবেন?'

নুরুজ্জামান বিরক্ত মুখে বললেন, জ্বি না, আমি ভাত খাব। ভাতের অর্ডার দিয়েছি।

ভাত চলে এসেছে। সুন্দর সরু চালের ভাত। হোটেলে খাবার একটাই সুবিধা। হোটেলে তরকারি যেমনই রাঁধুক, ভাত ভাল রাঁধে। বাড়ির ভাত কখনো এ রকম হয় না, কোন কোন দিন চাল-চাল থাকে, কখনো নরম কাদার মত। এই জন্যেই তিনি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছেন।

'স্যার, আপনি কি আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ করছেন?'

নুরুজ্জামান হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। সব্জি দিয়ে ভাত মাখতে লাগলেন। সব্জির চেহারা দেখতে ভাল। খেতে কেমন কে জানে!

'লালবাগের কেল্লা কেমন দখলেন স্যার?'

নুরুজ্জামান চমকে উঠলেন, ঐ লোকটি লালবাগ কেল্লা থেকেই পেছনে লেগেছে? সর্বনাশের কথা! মতলবটা কি?

'আপনি যখন কেল্লা দেখছিলেন আমিও দেখছিলাম। আমি অবশ্যি এর আগেও অসংখ্যবার দেখেছি। বাংলাদেশে দেখার কিছু নেই। একই জিনিশ বারবার দেখতে হয়। লালবাগের কেল্লা আপনি কি এই প্রথম দেখলেন?'

'জ্বি।'

'পুরানো আমলের জিনিশ দেখতে যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে সম্রাট শাহজাহানের আমলের একটা গেট আছে, দেখে আসতে পারেন। ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাবেন, টিএসসি এবং বাংলা একাডেমীর সামনে দিয়ে যে বড় রাস্তাটা গেছে নজরুল সরণী, ঐ রাস্তার মাথায় গেটের অংশবিশেষ আছে। জায়গাটা

চিনেছেন? চার নেতার কবরের পাশে।'

'নুরুজ্জামান হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছেন। এরা রান্না ভাল করে। সব্জিটা ভাল রেঁধেছে। তারপরেও কাস্টমার কেন পাচ্ছে না? একদিন হেটেল আমানিয়াতে খেয়ে দেখতে হবে। কে জানে হয়ত ওদের রান্না আরো ভাল।'

'প্রায় তিনশ বছরের পুরানো একটা গীর্জা আছে — আর্মেনিয়ান গীর্জা।'

'গীর্জা ফির্জা আমি দেখিনা।'

'স্যার, মনে হচ্ছে আমার প্রতিটি কথায় বিরক্ত হচ্ছেন। আমার পরিচয় পেলে অবশ্যি আর বিরক্ত হবেন না। আমি একজন ভ্যাম্পায়ার।'

খাওয়া বন্ধ রেখে নুরুজ্জামান মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কি?

'ভ্যাম্পায়ার? ভ্যাম্পায়ার চিনেন না? ঐ যে কাউন্ট ড্রাকুলা। ট্রানসেলভেনিয়ার বিখ্যাত কাউন্টের গল্প পড়েননি?'

নুরুজ্জামান আবার খেতে শুরু করলেন, এবং মনে মনে বললেন, ব্যাটা বদমাস! ভ্যাম্পায়ার সেজেছে!

'আপনার মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। না পারারই কথা। ভ্যাম্পায়ার কি সেই সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। গল্পের বই, সিনেমা থেকে আহরিত জ্ঞানের সবই ভুল।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি তাই! লোকজ বিশ্বাস হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার রাতে মানুষের রক্ত খেয়ে বেড়াবে, দিনে কফিনের ভেতর শুয়ে থাকবে। কারণ রোদ গায়ে লাগা মানে তাদের মৃত্যু। আমাকে দেখুন দিনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তাই তো দেখছি।'

'শুধু চোখগুলি প্রটেক্ট করতে হয়। চোখে রোদ লাগানো যায় না।'

'এই জন্যই সানগ্লাস?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'মানুষের রক্ত আপনি কখন খান? দিনে না রতে? মানুষের রক্ত খান তো?'

'জ্বি খাই। বাধ্য হয়ে খেতে হয়। ভ্যাম্পায়ারদের জন্যে কিছু এসেনসিয়াল ভিটামিন মানুষের রক্ত ছাড়া পাওয়া যায় না।'

'ও আচ্ছা।'

'স্যার, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

'না। আপনি আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে রক্ত খেয়ে ফেলবেন এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সেভাবে রক্ত খাই না। ব্লাড ব্যাংক থেকে কিনে নিয়ে আসি। একটা প্যাকেটে এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ চলে যায়। ব্লাড ব্যাংকগুলি থাকায় সুবিধা হয়েছে। পছন্দসই

রক্ত কিনতে পারছি। সব রকম রক্ত সবার স্যুট করে না। আমায় পছন্দের রক্ত হল বি নিগেটিভ।'

'শুনে ভাল লাগল।'

'আপনার রক্তের গ্রুপ কি স্যার?'

'জানি না রক্তের গ্রুপ কি। পরীক্ষা করাইনি।'

'পরীক্ষা করিয়ে রাখা ভাল। শহরে মানুষ যে হারে বাড়ছে — অ্যাকসিডেন্ট তো হামেশাই হচ্ছে। যে দিকে তাকাই শুধু মানুষ। মানুষের বৃদ্ধির হার খুবই আশংকাজনক।'

'ভ্যাম্পায়ারের সংখ্যা বাড়ছে না?'

'মানুষের তুলনায় কম। আগে আমরা মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে রক্ত খেতাম। তখন ভ্যাম্পায়ার বেশি ছিল। এখন ব্লাডব্যাংক থেকে আমরা রক্ত খাচ্ছি। কাজেই ভ্যাম্পায়ারের সংখ্যা বাড়ছে না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

'কিছু মনে করবেন না। আমি ব্যাপারটা বোঝার কোন আগ্রহ বোধ করছি না।'

'শোনার পর আগ্রহবোধ করবেন। ভাত খেতে খেতে শুনুন। শুনতে তো ক্ষতি নেই। ভ্যাম্পায়ার আসলে ভাইরাসঘটিত এক ধরনের অসুখ।'

'ও, আচ্ছা।'

'ভাইরাসগুলি অতি দীর্ঘজীবী। এরা বিশেষ ধরনের মৃত্যুহীন ভাইরাস। মানুষের শরীরে একবার ঢুকতে পারলে তারা আর মরে না। এবং যার শরীরে তারা ঢুকেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে। মানুষ মরে গেলে তো তারাও মরে যাবে। ঠিক না?'

'ঠিক বলেই তো মনে হয়।'

'আমাদের যে রক্ত খেতে হয় তা ঐ ভাইরাসগুলির জন্যেই। রক্তটা ওদের জন্যেই দরকার।'

'ও।'

'একটা ভ্যাম্পায়ার যখন কোন মানুষের রক্ত খায় তখন ভাইরাস একজনের গায়ে থেকে অন্য জন্যের গায়ে ঢোকে। আজকাল আমরা ব্লাড ব্যাংকের রক্ত খাওয়া ধরেছি। তাই ভাইরাসজনিত সংক্রমণ অনেক কমে গেছে।'

'ভাল।'

'তবে একেবারে যে নেই তাও না। হঠাৎ হঠাৎ অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যারা আসলে ভ্যাম্পায়ার। যেমন আজ যখন আপনাকে লালবাগের কেল্লায় দেখলাম তখন আপনাকে ভ্যাম্পায়ার ভেবেছিলাম।'

নুরুজ্জামান হতভম্ব গলায় বললেন, আমাকে ভ্যাম্পায়ার ভেবেছিলেন?

'জ্বি। আশা করি আমার কথায় আহত হননি।'

নুরুজ্জমান কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার গালে ঠাশ করে একটা চড়

দিতে পারলে মনটা শান্ত হত। তিনি চড় দিলেন না, শুকনো গলায় বললেন — আমাকে আপনি ভ্যাম্পায়ার ভেবেছিলেন?

'জ্বি। আপনার চোখে সানগ্লাস ছিল। আপনি ভ্যাম্পায়ারের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরছিলেন। আমরা ভ্যাম্পায়াররা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘোরাফেরা করি। আমাদের তো কোন কাজ কাম নেই। অফিসে যেতে হয় না। হা হা হা।'

নুরুজ্জামান সাহেবের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি আরও বিরক্ত হয়ে হাত ধুয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। লোকটা হয় বদ্ধ উন্মাদ কিংবা অন্য কোন বদ মতলব আছে। মতলবটা কি ধরা যাচ্ছে না।

'স্যারের খাওয়া তো হয়েছে। এবার আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিন।'

'না, সিগারেট খাই না।'

'সিগারেট অবশ্যই খান। না খেলে সঙ্গে দেয়াশলাই রাখতেন না। আপনার পকেটে দেয়াশলাই দেখা যাচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে সিগারেট নিলে ক্ষতি নেই। ভ্যাম্পায়ার ভাইরাস আপনাকে ধরবে না। এই ভাইরাস শুধুমাত্র রক্তবাহিত।'

নুরুজ্জামান সিগারেট নিলেন।

'স্যার, পান খাবেন? চমন বাহার দিয়ে একটা মিষ্টি পান দিতে বলি। ভাত খাবার পর পান খেলে ভাল লাগবে।'

'না, পান খাব না।'

লোকটা নুরুজ্জামান সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। অনেকেই আছে, তারা নিজেরা বুঝতে পারে না যে তারা ভ্যাম্পায়ার। দিব্যি মানুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমরা যারা ভ্যাম্পায়ার তাদের দায়িত্ব হচ্ছে — ওদের জানানো। হয় কি জানেন, ব্লাড ট্রান্সফিউশান থেকে ভ্যাম্পায়ার ভাইরাস গায়ে ঢুকে গেল। এইড্‌স্ ভাইরাসে ধুম করে লোক মরে যায়। ভ্যাম্পায়ার ভাইরাসে এ ধরনের আর মৃত্যু নেই। সেটাও এক যন্ত্রণা। দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে কি আর ভাল লাগে? জীবন বোরিং হয়ে যায়।

'আপনি কতদিন ধরে বেঁচে আছেন?'

'প্রায় তিনশ বছর। লালবাগের কেল্লা এই নিয়ে পঁচাত্তর বার দেখলাম। ঠিক করেছি আরো পঁচিশ বার দেখে একশ' পুরা করব। তারপর আর দেখব না।'

'ভ্যাম্পায়ারের লক্ষণ কি?'

'লক্ষণ খুব সহজ। ভ্যাম্পায়ারদের রোদে ছায়া পড়ে না।'

'কেন?'

'কেন সেটা জানি না। ছায়া পড়ে না এইটুকু জানি। স্যার, যাই, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল।'

'কাঁচা সুপারি আনতে বলেছিলাম, এনেছ? না ভুলে বসে আছ? যেটা বলা হয় সেটা তো মনে থাকে না।'

আজ মনে আছে। বাজারে ঢুকেই প্রথম কাঁচা সুপারি কিনেছেন।

'শিং মাছ আনতে বলেছিলাম, এনেছ? না রাক্ষুসী মাগুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছ? তুমি কচি খোকা তো, যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর। আশ্চর্য মানুষ! কত করে নিয়েছে মাছ?'

'পঁচিশ টাকা নিয়েছে। পাঁচ টাকা পিস।'

(নিজাম সাহেব মিথ্যা বলতে পারেন না। মিথ্যা কথা তাঁর গলার ফুটো দিয়ে বের হয় না। তাঁর ধারণা তার গলার ফুটো খুব সরু বলে এই সমস্যা হয়। তবে আজ বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হবে।)

'পাঁচটা মাছ পঁচিশ টাকা নিল? বাড়িতে কি টাকার গাছ পুঁতে রেখেছ? না তুমি বাংলাদেশের মন্ত্রী-মিনিস্টার? একটা দাম বলবে আর হুট করে দিয়ে দিবে? নাকি মেছো হাটায় গিয়ে বড়লোকি চাল দেখাও? দরদাম করতে ভাল লাগে না? পাঁচ টাকা পিস শিং মাছ কি মনে করে কিনলে? এই শিং মাছগুলির শিং কি সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

ফরিদার এই সব কথা তাঁকে মাথা নিচু করে শুনতে হবে। কোন উপায় নেই। তিনি যদি বলেন মাছ পনেরো টাকা হয়েছে, তিন টাকা করে পিস। তারপরেও কথা শুনতে হবে।

'ঝিনুকের চুন আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

নিজাম সাহেব চমকে উঠলেন। ঝিনুকের চুন আনা হয়নি। কি সর্বনাশ! ভেবে রেখেছিলেন সব বাজার শেষ হলে চুনটা কিনবেন। এইটাই ভুল হয়েছে। কাঁচা সুপারি কেনার সময়ই চুনটা কেনা উচিত ছিল। চুন ছাড়া বাড়িতে যাওয়াই যাবে না। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর উচিত ছিল পেছন ফিরে যে দিক থেকে এসেছেন সেদিক রওনা হওয়া — তা না করে তিনি ঠিক করলেন রাস্তা পার হবেন। প্রাচীন একটা কুসংস্কার আছে — যে রাস্তায় আসবে সে রাস্তায় ফেরত যাবে না।

রাস্তা বদল করতে গিয়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল। দশ টনি এক ট্রাক তাঁর গায়ের উপর এসে পড়ল। তাঁকে চাপা দিয়ে উল্কার গতিতে পার হয়ে গেল। অ্যাকসিডেন্টের পর ট্রাকওয়ালারা খুব সাবধান থাকে। ট্রাক থামায় না। ট্রাক থামালে পাবলিকের হাতে ধরা খেতে হবে। এটা হতে দেয়া যায় না।

দশ টন মাল বোঝাই একটা ট্রাক নিজাম সাহেবের উপর দিয়ে চলে গেছে, তারপরেও তিনি খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, তিনি তেমন ব্যথা পাননি। ইনজেকশনের সূচ ফোটার মত ব্যথা — যা মোটেই ধর্তব্য নয়। ট্রাক-চাপা পড়লে ব্যথা পাওয়া যায় না — এই সত্য আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতের তরকারির ব্যাগ এবং মাছের ব্যাগ ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। মাছের ব্যাগ

থেকে মাছগুলি বের হয়ে এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। নর্দমার মধ্যে পড়লে এদের আর পাওয়া যাবে না। নিজাম সাহেব অতি ব্যস্ত হয়ে মাছগুলির কাছে ছুটে গেলেন। বাড়িতে শিং মাছ না নিয়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। তিনি ট্রাক-চাপা পড়েছেন এই ঘটনা শুনেও ফরিদা তাঁকে রেহাই দেবে না।

নিজাম সাহেব উবু হয়ে বসলেন, মাছ ধরতে গেলেন, ধরতে পারলেন না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে মাছগুলি বের হয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! ঘটনা কি? এর মধ্যে প্রচুর হৈ চৈ শুরু হয়েছে। রাস্তার উপর শত শত লোক জমে গেছে। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। নিজাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন — রক্তে রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। সেই রক্তে মাখামাখি হয়ে যে শুয়ে আছে সে আর কেউ না, তিনি নিজে।

এই দৃশ্য দেখার পরেও তাঁর বুঝতে কিছু সময় লাগল যে তিনি আসলে মারা গেছেন। অপঘাতে মৃত্যুর পর মানুষ ভূত হয়। তিনিও তাই হয়েছেন। ভূত হয়েছেন বলেই কেউ তাকে দেখতে পারছে না — তবে তিনি নিজে নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পারছেন। যদিও তাঁর শরীরগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে তিনি শিং মাছ ধরতে পারছেন না। মাছগুলি হাতের আঙুল ভেদ করে বের হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর আগে তাঁর গায়ে যে পোশাক ছিল, ভূত হিসেবেও তাঁর গায়ে একই পোশাক। এমনকি শিং মাছের পানি লেগে প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল — এখনও প্যান্টটা ভেজা। ভেজা প্যান্ট থেকে আঁশটে গন্ধ আসছে। ভূতরা তাহলে গন্ধ পায়? এই রহস্যময় ব্যাপারটার মানে কি কে জানে। তবে কোন রহস্যময় ব্যাপার নিয়ে আপাতত তাঁর মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করছে না। মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। ধাতস্থ হতে সময় লাগবে। সিগারেট খেতে পারলে হত। ভূতরা সিগারেট খায় কি না তিনি জানেন না।

অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশ চলে এসেছে। ট্রাফিক পুলিশ পোঁ পোঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছে। কি হয়েছে সবাই এক নজর দেখতে চায়। তিনিও উঁকি দিলেন। এমন ভিড় যে কিছু দেখার উপায় নেই। নিজের ডেডবডি অথচ তিনি নিজে দেখতে পারছেন না। এরচে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পরে? তিনি ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর পিঠে কে যেন হাত রেখে বলল, স্যার, আপনিই মারা গেছেন?

নিজাম সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, জ্বি।

নিজের মৃত্যুর কথা নিজের মুখে বলতে লজ্জা লাগল।

'খুবই আফসোসের কথা। ভেরি স্যাড।'

লোকটির কথায় নিজাম সাহেব অভিভূত হলেন। যখন মানুষ ছিলেন তখন এত সহানুভূতি নিয়ে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। ভূত হবার পর মানুষের সহানুভূতি পাচ্ছেন, এটা তুচ্ছ করার ব্যাপার না।

'স্যার, আপনার নাম কি?'

'নিজাম। নিজামুদ্দিন।'

'আমার নাম মোতালেব। আমিও আপনার মত ভূত। ঐ যে টাইলসের একটা দোকান দেখছেন "ইউরেকা টাইলস" আমি ছিলাম ঐ দোকানের ম্যানেজার।'

'ও।'

'দোকানের মধ্যেই পা পিছলে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। হাসপাতালে নেবারও সুযোগ হয়নি।'

'ও।'

তারপর থেকে এইখানেই আছি। রাতে দোকানে ঘুমাই।'

নিজাম সাহেব আবারও বললেন, ও।

'মেইন রোডের উপর দোকান। ট্রাক-ফাক সারারাত চলে, ঘুম ভাল হয় না।'

ভূতদের ঘুমের প্রয়োজন হয় তাঁর জানা ছিল না। ভূত জগৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। ধীরে ধীরে সব জানবেন। মোতালেব সাহেবকে পাওয়ায় তাঁর লাভ হয়েছে। সাধারণ জিনিশগুলি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে।

মোতালেব বলল, এইখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে কি করবেন স্যার, চলে যান।

নিজাম সাহেব বললেন, কোথায় যাব?

'ভাবীর কাছে চলে যান। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভাবীর আশেপাশে থাকলেও একটা সান্ত্বনা।

'যাব কি ভাবে?'

'রিকশা করে চলে যান। আপনার তো আর রিকশা ভাড়া লাগবে না। চালু একটা রিকশা দেখে লাফ দিয়ে সীটে উঠে বসে পড়ুন। আপনার বাসা কোথায়?'

'কলাবাগান।'

'ঐ দিকে যাচ্ছে এমন একাট রিকশায় উঠে বসুন। আমি অবশ্যি কোথাও যেতে হলে গাড়িতে করে যাই। তবে রিকশার আলাদা মজা আছে।'

নিজাম সাহেব চুপ করে আছেন। এত দিন ভেবেছিলেন ভূতরা বাতাস হয়ে ঘুরে বেড়ায় — এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপার সে রকম নয়। চলাফেরার জন্যে তাদেরও রিকশা, বেবীটেক্সি লাগে।

মোতালেব বলল, স্যারের মনটা এত খারাপ কেন?

নিজাম সাহেব বললনে, না না, মন খারাপ না। একটু ইয়ে লাগছে। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ভূত হয়ে গেলাম।

মোতালেব বলল, একটু ইয়ে তো লাগবেই। শুধু একটু না, অনেকটু ইয়ে লাগবে। আধঘন্টা আগেও ছিলেন মানুষ, এখন হয়েছেন ভূত। আমি যখন প্রথম ভূত হই — কি অভিজ্ঞতা! কি করব না করব কিছুই জানি না। তখন ছিল ঘোর

বর্ষা, বুঝলেন ভাই সাহেব। আমি বেকুবের মত সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলাম। তার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছা করলেই যে কোন বাড়িতে ঢুকে যেতে পারতাম। আমরা হলাম ভূত — দরজা বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, আমরা যে কোন ফুটোফাটা দিয়ে ঢুকতে পারি, তাই না?

কিছু না বুঝেই নিজাম সাহেব বললেন, জ্বি।

'বুঝলেন ভাই সাহেব, যেহেতু কিছুই জানি না — সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে আমার হয়ে গেল সর্দি। বুকে কফ বসে গেল — খকর খকর করে কাশি।'

নিজাম সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ভূতদের সর্দি হয়?

মোতালেব বিরক্ত হয়ে বলল, ব্যাঙের যদি সর্দি হতে পারে, ভূতের হবে না কেন? আমরা কি ব্যাঙের চেয়েও খারাপ?

নিজাম সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। মোতালেব বলল, শুধু শুধু দেরি করছেন কেন স্যার? চলে যান। ভাবীর পাশে বসে থাকুন। আপনার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর পর ভাবী আছাড়-পিছাড় খেয়ে কাঁদবে। ঐ দৃশ্য দেখে খুব মজা পাবেন। একটা রিকশা নিয়ে চলে যান। তবে চোখ-কান খোলা রাখবেন — একটু কেয়ারফুল থাকবেন।

'কেয়ারফুল থাকব কেন?

'কিছু সন্ত্রাসী ভূত আছে। চাঁদাবাজ। ভদ্রতা বলতে কিছুই জানে না। মানুষ থাকতে যেমন বদ ছিল মরে আরো বদ হয়েছে। অকারণে মারধোর করে।'

নিজাম সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, সে কি!

'পরশুদিনের ঘটনা — একটা পাজেরো গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নতুন গাড়ি দেখে লোভ লাগল। গাড়ির প্রতি আমার আবার একটা দুর্বলতা আছে। বিকেলের দিকে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। পাজেরো দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। লাফ দিয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি যাচ্ছিল গুলশানের দিকে। ফার্মগেটেই রেড লাইট। গাড়ি থামছে। আমি বেকুবের মত মাথা বের করেছি। আমাকে দেখেই চার-পাঁচ সন্ত্রাসী ভূত হৈ চৈ করে ছুটে এল। আমি কিছু বোঝার আগেই জানালা দিয়ে টেনে বের করে ফেলল। দিল ধোলাই —। এখনো আমার হাতে-পায়ে ব্যথা।

নিজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, সর্বনাশ!

'অপঘাতে যারা মারা যায় তারাই তো ভূত হয় — অপঘাতে মারা যায় কারা? সন্ত্রাসী-খুনী-চাঁদাবাজ। আমরা যারা সাধারণ ভূত তারা এদের হাতে জিম্মি। কাওরান বাজারে এক খুনী-ভূত আছে — রামদা হাতে বসে থাকে। কাউকে দেখলেই হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করে রামদা হাতে ছুটে আসে। ভাই সাহেব, কাওরান বাজার এলাকার দিকে ভুলেও যাবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মিরপুর চার নাম্বারেও যাবেন না।'

'ঐখানে কি?'

'মিরপুরে আছে দুই ভাই — ছদরুল-বদরুল, দুভাই-ই ভয়ঙ্কর। আমার ফ্যামিলি থাকে মীরপুরে। দু'বছরের উপর হয়ে গেল ওদের দেখতে যেতে পারি নাই। মন মানে না, দেখতে ইচ্ছ করে — বেকুবের মত একবার চুপি চুপি চলে গেছি, বাসায় উঠার আগেই দু'জনের হাতে ধরা পড়লাম। কিরিচের এক কোপে তারা আমার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে ফেলল — তারপর সেই কাটা পা নিয়ে কি খুশি! ফুটবলের মত ছোঁড়াছুঁড়ি করে। ওরা পা নিয়ে লাফালাফি করছিল, আমি সেই ফাঁকে কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি। দু'মাস ভুগলাম — দুই মাসে নতুন পা গজাল।'

'পা গজায়?'

'তা গজায়। লেজের মত গজায় — ভূত হবার এই এক সুবিধা।। যখন পা কাটা গেল তখন জানতাম না পা আবার গজায়। খুব মন-কষ্টে ছিলাম, তারপর একদিন দেখি পা গজিয়েছে। দেখুন না।'

ভদ্রলোক পায়জামা পরে ছিলেন। পায়জামা সরিয়ে গজানো পা দেখালেন। এবং নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গজানো পা আসল পায়ের মত হয় না। দুর্বল হয় — জোর পাওয়া যায় না। তবু যে পা গজায় সেটা কম না। ভূত-জীবনে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। হাত-পা গজানোর সিস্টেম না থাকলে বিরাট বিপদ ছিল।

'মাথা গজায়?'

'মাথা কাটা পড়লে মাথাও গজায়। সেই মাথা সাইজে ছোট হয়।'

নিজাম সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ভাই সাহেব, আপনি কি আমার সঙ্গে একটু আসবেন? একা যেতে ভয়-ভয় লাগছে। মোতালের সঙ্গে সঙ্গে বলল, চলুন। আপনার উপর মায়া পড়ে গেছে। আপনাকে একা ছাড়তেও ইচ্ছা করছে না। ভূত যদি ভূতকে না দেখে, তাহলে কে দেখবে? একটা গান আছে না — ভূত ভূতের জন্যে . . .

মোতালেব গান ধরল। গলায় সুর বেশ ভাল। একটু ন্যাকি ন্যাকি তারপরও শুনতে খারাপ লাগছে না। কয়েক লাইন গেয়ে বলল, স্যারের গান-বাজনার চর্চা আছে?

'জ্বি না।'

'চর্চা থাকলে ভাল হত। আমাদের সময় কাটে না তো — গান-বাজনা করে সময় কাটাই। চলুন রওনা হই — রিকশায় যাবেন, না গাড়িতে? রিকশায় যাওয়া ভাল। আপনার তো নিশ্চয়ই চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে ওঠার অভ্যাস নেই। শিখে যাবেন। বেঁচে থাকার জন্যে সবই শিখতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। ভূতদের জীবন হল সংগ্রামী জীবন।'

নিজাম সাহেব চমকে উঠলেন। ভূতদের জীবন সংগ্রামী জীবন — তার মানে কি? বেঁচে থাকতে সংগ্রাম, মরার পরেও সংগ্রাম? কি ধরনের সংগ্রাম মোতালেবকে

জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া ভল।

মোতালেবকে জিজ্ঞেস করা হল না। তার আগেই সে গান ধরল —

'আইজ পাঁশা খেঁলবরে ভূতনী
ও ভূতনী তোঁমার সঁনে।
একেঁলা পাইঁয়াছিরে ভূতনী
এই নিঘোর বঁনেঁ . . .'

নিজাম সাহেবের ভাল লাগল। মোতালেবের গলা আসলেই ভাল। তালজ্ঞানও ঠিক আছে। নিজাম সাহেব হাতে তাল দিতে লাগলেন। মোতালেব গান থামাল —

'স্যার।'

'জ্বী।'

'একটা খালি রিকশা যাচ্ছে, চলুন উঠে পাড়ি। আমার হাত ধরে লাফ দিন। হাই জাম্প। ছোটবেলায় হাই জাম্প দেননি?'

'জ্বি না।'

ছোটবেলায় হাই জাম্প না দিলেও নিজাম সাহেব ভালই লাফ দিলেন। রিকশার পাটাতনে গড়িয়ে পড়লেন। মোতালেব তাঁকে সীটে টেনে তুললো। নিজাম সাহেব বললেন — রিকশায় প্যাসেঞ্জার উঠলে আমরা কি করব?

মোতালেব হাই তুলতে তুলতে বলল, কোন সমস্যা নেই। তখন আমরা প্যাসেঞ্জারদের কোলে বসে থাকব। ভূত হবার এও এক মজা। মানুষের কোলে বসে বসে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

মানুষের কোলে বসে জীবন কাটিয়ে দেবার ব্যাপারটা নাজিম সাহেবের খুব রুচিকর মনে হল না। তিনি কিছু বললেন না। রিকশার হুড ধরে বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি পিঠে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করছেন। অস্বস্তিকর ব্যথা। যেন মেরুদণ্ড ধরে কেউ একজন হালকাভাবে তাঁকে পেছন দিকে টানছে। ব্যথাটা শুরুতে হালকা থাকলেও রিকশা যতই এগুচ্ছে ততই বাড়ছে। মোতালেবকে ব্যাপারটা বলবেন কি না তিনি বুঝতে পারছেন না। ভৌতিক ব্যাপার হয়ত সে অনেক ভাল জানে। রিকশায় চড়লে সব ভূতদেরই হয়ত পিঠে ব্যথা করে। এটাই নিয়ম। ব্যথাটা বাড়ছে, কিছুতেই যাচ্ছে না। ব্যথা কমাবার জন্যে নিজাম সাহেব খুক খুক করে কাশলেন। মোতালেব মাথা ঘুরিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, কাশছেন কেন?

'কাশি আসছে এই জন্যে কাশলাম। ভূতদের কি কাশা নিষেধ?'

'কাশা নিষেধ না। আপনার কাশির ধরনটা ভাল না। পিঠে ব্যথা আছে?'

নিজাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ আছে।

'মেরুদণ্ডে?'

'জ্বি।'

'সর্বনাশ! লাফ দিয়ে নামুন দেখি রিকশা থেকে।'

নিজাম সাহেব রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। ভীত গলায় বললেন, কি হয়েছে?

'সাড়ে সর্বনাশ হয়ে গেছে। পিছন দিকে দেখেন।'

নিজাম সাহেব পিছন ফিরে দেখলেন — তাঁর পেছনে রঙিন এক ফিতা — ফিতার এক মাথা তার পিঠে লাগছে, অন্য মাথা বহু দূর চলে গেছে।

মোতালেব বিরক্ত হয়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছেন?

'জ্বি না।'

'আরে ভাই, আপনি তো এখনো মরেন নাই। মনে হয় ডাক্তার আপনার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিছু নির্বোধ ডাক্তার আছে না, রোগীকে বাঁচাবার জন্যে জীবন দিয়ে দেয়। একজন মরতে চাচ্ছে মরতে দাও — তা দেবে না। বাঁচিয়ে তুলবে। বাঁচিয়ে তুলে লাভটা কি?'

নিজাম বললেন, ফিতার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

'আপনার রক্ত মাংসের শরীরের সঙ্গে এই ফিতা লাগানো। ফিতায় টান পড়ছে, তার মানে হল আপনাকে ঐ শরীরে ঢুকতে হবে। ব্যথা, যন্ত্রণা, চিকিৎসা চলবে — ওই, শরীরে ঢুকতে চান?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কোন দরকার নাই। যা আছেন ভাল আছেন। দেখি চেষ্টা করে ফিতা ছিঁড়তে পারি কিনা। আপনিও হাত লাগান। আরো কয়েকজন ভূত পেলে ভাল হত — একসঙ্গে টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন — আমি দেখি কয়েকজনকে নিয়ে আসি। খবর্দার, যাবেন না। এই টেলিফোনের খাম্বা ধরে দাঁড়ান। দু' হাতে শক্ত করে খাম্বা ধরে থাকুন, নয়ত ফিতার টানের চোটে উঠে চলে যাবেন। মহাবিপদে পড়লাম দেখি।'

নিজাম সাহেব টেলিফোনের খাম্বা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পিঠের টান বাড়ছে। তাঁর একবার মনে হল খাম্বাশুদ্ধ তাকে বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন টান। ইতিমধ্যে মোতালেব তিন-চারজন ভূত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারা ফিতা ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। লাভ কিছু হচ্ছে না। এক সময় টান প্রবল হল — নিজাম সাহেব টেলিফোনের খাম্বা ছেড়ে দিলেন। তাঁর মনে হল তিনি ঝড়ের মত ছুটে যাচ্ছেন। ভয়াবহ অবস্থা! মানুষ (নাকি ভূত?) এমন বিপদে পড়ে!

নিজাম সাহেবের মাথার অপারেশন শেষ হয়েছে। নিউরোলজির সার্জেন্ট প্রফেসর ইফতেখারুল ইসলাম — হাতের গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে বলেই আমার ধারণা। রোগীর বেঁচে থাকার কথা। অবশ্যি চব্বিশ ঘন্টা পার না হলে কিছু বলা যাচ্ছে না — তারপরেও আমি

আশাবাদী। চোখের মণিতে আলো ফেলে দেখুন তো রিফ্লেক্স একশান কেমন?

একজন ডাক্তার নিজাম সাহেবের চোখের মণিতে আলো ফেললেন। চোখের মণি বড় বড় হয়ে আছে। নিজাম সাহেবের ভূত তাঁর শরীরের কাছেই বসা। তিনি শরীরের ভেতর ঢোকার তীব্র আকর্ষণ বোধ করছেন — কোন দিক দিয়ে ঢুকবেন বুঝতে পারছেন না।

'স্যার।'

নিজাম সাহেব চমকে তাকিয়ে দেখেন মোতালেব চলে এসেছে। বোধহয় দৌড়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে।

নিজাম সাহেব মোতালেবের দিকে তাকালেন। মোতালেব বলল, খামাখা আর বসে আছেন কেন? এরা তো মনে হয় আপনাকে বাঁচাবেই — শরীরে ঢুকে পড়ুন।

'কোন দিক দিয়ে ঢুকব?'

'চোখের মণি দিয়ে ঢুকে পড়ুন। চোখের মণি দিয়ে ঢোকাটা সহজ হবে।

'ভয় লাগছে তো।'

'কচি খোকা নাকি, ভয় লাগছে! ভাবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।'

'সেকি, হাসপাতালের বারান্দায় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ভাবীর সঙ্গে আপনার ছোট মেয়েটাও আছে। বেচারী বোধ হয় খুব বাপ ভক্ত। কান্নাকাটি যে ভাবে করছে বলার না।'

'খুব কাঁদছে?'

'আহারে, শুধু শুধু কথা বলে সময় নষ্ট। ঢুকে পড়ুন তো।

নিজাম সাহেব তাঁর চোখের মণির ভেতর দিয়ে নিজের শরীরে ঢুকলেন।

যে ডাক্তার চোখের মণির উপর আলো ফেলছিল সে আনন্দিত গলায় বলল, রিফ্লেক্স একশান ভাল। চোখের মণি ছোট হচ্ছে। এ যাত্রা বোধ হয় টিকে গেল। ট্রাকের নিচে পড়েও বেঁচে যায় — এই প্রথম দেখলাম। একেই বলে ভাগ্য।

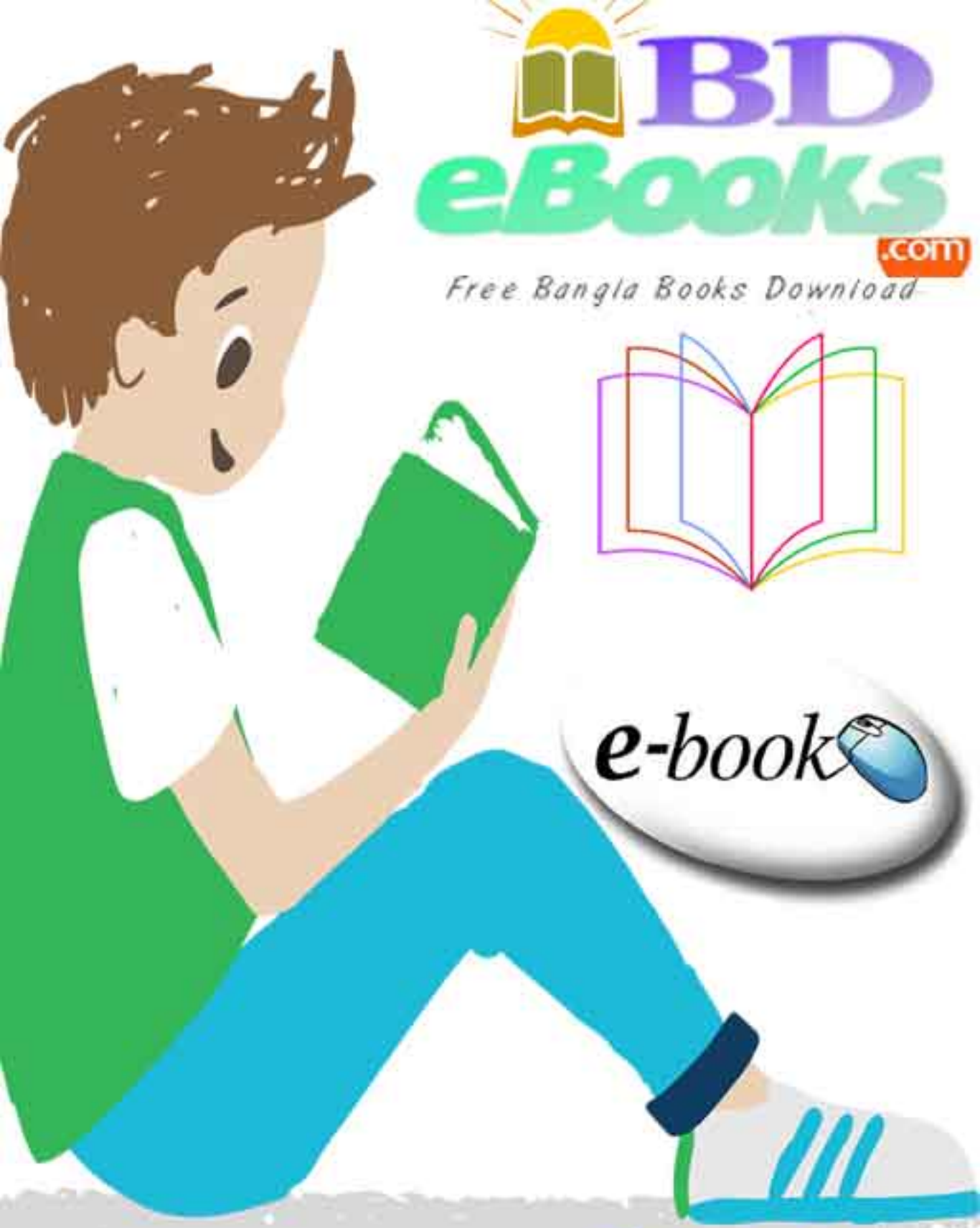

For More Books Visit: www.BDeBooks.Com
Like Us On Facebook: FB.Com/BDeBooksCom
Email Us: mail.shariful1@gmail.com